২০ আগস্ট ২০১৪, জাতীয় দাবি দিবস

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির ডাকে আলোচনা সভা

২১-২২ জুন ২০১৪, জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের গুলমার্গ-এ অনুষ্ঠিত সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভা থেকে সমস্ত অন্তর্ভুক্ত সংগঠনগুলির কাছে ২০ আগস্ট দেশব্যাপী দাবি দিবস প্রতিপালনের আহ্বান জানানো হয়। জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে ঐদিন সংগঠনের কেন্দ্রীয় দপ্তর কলকাতার কর্মচারী ভবনের অরবিন্দ সভাকক্ষে, এই দিবস প্রতিপালনের জন্য নির্দিষ্ট ৫ দফা দাবিকে (৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) সামনে রেখে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভাটিতে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান সুকোমল সেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সর্বভারতীয় সংগঠনের অন্যতম সহ-সভাপতি স্মরজিৎ রায়চৌধুরী এবং অন্যতম সম্পাদক অনন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। যৌথ কমিটি, জয়েন্ট কাউন্সিল, স্টিয়ারিং কমিটির প্রতিনিধিরাও সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সুকোমল সেন

অসিত ভট্টাচার্য

বিকেল ৫.৪৫ মিনিটে আলোচনা সভার কাজ শুরু হয়। সভা পরিচালনা করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভাপতি অশোক পাত্র। সাম্প্রতিক সময়ে গণআন্দোলন ও কর্মচারী আন্দোলনের নেতৃত্ব সংগঠক-কর্মী যাঁরা প্রয়াত হয়েছেন এবং শাসক দলের লুম্পেন বাহিনীর লালসা ও নৃশংসতার শিকার কাঁথির অঙ্গনওয়ারি কর্মী সহ এই সময়কালে ঘাতক বাহিনীর বর্বরতার যাঁরা শিকার হয়েছেন, তাঁদের সকলের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে নীরবতা পালন করা হয়।

সভায় প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক অসিত ভট্টাচার্য। তিনি তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে এই দিবস প্রতিপালনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। প্রধান বক্তা সুকোমল সেন রাজ্য ও সর্বভারতীয় পরিস্থিতির বিভিন্ন নেতিবাচক দিক ব্যাখ্যা করেন। তিনি রাজ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে বলেন, এখানে দুর্বৃত্তদের শাসন চলছে এবং দুর্বৃত্তদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং। ফলে কর্মচারীরা ভিতরে ভিতরে ক্ষুব্ধ হলেও ভয় পাচ্ছেন। তিনি বলেন এই ভয় কাটাতে হবে।

(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমে)

যৌথ আন্দোলনের ব্যাকরণকে রপ্ত করতে হয়

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের বিভিন্ন বকেয়া দাবি-দাওয়া পূরণ, অর্জিত অধিকার রক্ষা এবং প্রশাসনের গণতান্ত্রিক চরিত্র ও কর্মচারী বন্ধুদের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার স্বার্থে আন্দোলন-সংগ্রামের ধারাবাহিক কর্মসূচী গ্রহণ করা হচ্ছে। আগামী ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৪, তেমনই একটি কর্মসূচী প্রতিপালিত হবে কলকাতা ও শিলিগুড়িতে পাঁচ দফা দাবির ভিত্তিতে দু'টি কেন্দ্রীয় সমাবেশের মধ্য দিয়ে। এই সমাবেশ দুটির প্রস্তুতি পর্বে গোটা রাজ্য জুড়ে বিভিন্নভাবে সমস্ত কর্মচারীর কাছে পৌঁছনোর চেষ্টা করা হচ্ছে। একই সময়ে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অন্তর্ভুক্ত সমিতিগুলিও তাদের নিজস্ব দাবি-দাওয়ার ভিত্তিতে তাদের অংশের কর্মচারীদের কাছে পৌঁছনোর যতটা সম্ভব চেষ্টা করছে। তবে এটাই সব নয়। আমরা জানি, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পরিধির বাইরে যে সংগঠনগুলি রয়েছে, তাদের মধ্যেও অনেকেই বিভিন্ন প্রতিবাদী কর্মসূচী গ্রহণ করছে। এটাই স্বাভাবিক এবং স্বাগতও। কারণ রাজ্য সরকার যখন চূড়ান্ত কর্মচারী বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করছে, তখন সকলেরই রাস্তায় নামা প্রয়োজন। এতে প্রতিবাদের স্বরটা আরো জোরালোই হবে।

প্রতিবাদী কর্মসূচী দু'রকমভাবে প্রতিপালিত হতে পারে। প্রত্যেক সংগঠন তার নিজস্ব স্বত্ত্বা বজায় রেখে, নিজস্ব সাংগঠনিক কাঠামো ও মঞ্চকে ব্যবহার করে কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারে, আবার কখনও কখনও পথ চলতে চলতে কাছাকাছি এসে অপরাপর সংগঠনের সাথে যৌথভাবে কিছুটা পথ চলার কথাও ভাবতে পারে। বিভিন্ন সংগঠনগুলির মধ্যে নীতিগত ও দৃষ্টিভঙ্গীগত পার্থক্য যা রয়েছে, তাকে বিসর্জন দিয়ে নয়, বজায় রেখেই এই কাজ করা সম্ভব। এটা কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা উদারতা প্রদর্শনের প্রশ্নও নয়। এমনকি যৌথ আন্দোলন কোনো লোক দেখানো 'ফ্যাশন শো'-ও নয়। পরিস্থিতির চাপই আপাত-বিরোধী অনেকগুলি সংগঠনকে কাছাকাছি আসতে, একসাথে আলোচনায় বসতে, একসাথে পথ চলতে বাধ্য করে। যেমন রামধনুর সাতটি রঙের প্রত্যেকটির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকলেও প্রিজমের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হবার সময় একীভূত হয়ে পড়ে, ঠিক তেমনই পরিস্থিতি নামক প্রিজম বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের সংগঠনকে এক জায়গায় এনে ফেলে। পদার্থ বিজ্ঞানে প্রিজমের মধ্য দিয়ে সাতটি রঙের একীভূত হওয়া আলোর প্রতিসরণ ধর্ম অনুযায়ী ঘটে। কিন্তু সমাজবিজ্ঞানে সংগঠনের কোনো অন্তর্নিহিত প্রতিসরণ ধর্ম নেই। পরিস্থিতি নামক প্রিজমের মধ্য দিয়ে পথ চলার সময় তারা এমনি এমনিই কাছাকাছি আসতে পারে না। এর জন্য প্রয়োজন হয়—সঠিক উপলব্ধি ও উদ্যোগ। আলোর প্রতিসরণ ধর্মের কারণেই প্রিজমকে সোজা রাখলে যেমন সাতটি রঙ একীভূত হয়ে উজ্জ্বলতর সাদা আলোর প্রকাশ ঘটায়, ঠিক তেমনই সেই সাদা আলোই উল্টে রাখা প্রিজমের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় আবার ভেঙ্গে যায়। সাতটি রং আবার আলাদা হয়ে যায়। উভয় ঘটনাই ঘটে আলোর প্রতিসরণ ধর্মের জন্যই। মানব উদ্যোগের ক্ষেত্রেও পরিস্থিতি নামক প্রিজমের উল্টো বা ভুল ব্যাখ্যা যৌথ উদ্যোগকে দানা বাঁধতে দেয় না, ভেঙ্গে ফেলে।

২৭ মার্চ ২০১৪ মুসলিম ইন্সটিটিউটে যৌথ কনভেনশন

আমাদের দেশে সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলি পারস্পরিক মত পার্থক্যকে চমৎকারভাবে কিছুটা দূরে সরিয়ে রেখে পরিস্থিতির চাহিদা অনুযায়ী একই মঞ্চে অবস্থান করছে, ধর্মঘটসহ সর্বভারতীয় আন্দোলন সংগ্রামের বিভিন্ন কর্মসূচীও গ্রহণ করছে। আমাদের ক্ষেত্রেও এমন উদ্যোগ কিছুটা ফলপ্রসূ হয়েছিল। যৌথ

(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমে)

রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প ও সংস্থাসমূহকে বাঁচানোর লড়াইয়ে শামিল শ্রমিক কর্মচারীরা

লুঠেরাদের হাত থেকে নিজেকে বাঁচানোর আহ্বান জানিয়ে ৪ জুলাই '১৪ অফিস ছুটির পর ধর্মতলার ওয়াই চ্যানেল থেকে কলেজ স্কোয়ার পর্যন্ত দৃপ্ত মিছিলে পা মেলালেন ১২ই জুলাই কমিটি, ব্যাঙ্ক এমপ্লয়ীজ ফেডারেশন (পশ্চিমবঙ্গ), বি এস এন এল কো-অর্ডিনেশন কমিটি, ইস্টার্ন রেলওয়ে মেনস ইউনিয়ন, মেট্রো রেলওয়ে মেনস ইউনিয়ন, ডিফেন্স এমপ্লয়ীজ ফেডারেশন (বেঙ্গল এরিয়া) এবং মার্কেন্টাইল ফেডারেশনের কয়েক সহস্র কর্মীবৃন্দ।

ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে দেশের ৩১ শতাংশ মানুষের সমর্থন নিয়ে কেন্দ্রে যে সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তারা দেশবাসীকে 'সুদিন' ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও তাদের রচিত প্রথম রেল বাজেট ও সাধারণ বাজেটের মধ্য দিয়ে দেশী বিদেশী শিল্পপতিদের মুনাফার পথকে প্রশস্ত করেছে। রেল, বীমা, প্রতিরক্ষা, রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্ক ব্যবস্থাকে ধ্বংস করাই সরকারের অভিপ্রায়। টেলিকম শিল্পে ১০০ শতাংশ বিদেশী বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত দেশবাসীকে চরম বিপদের সম্মুখীন করে তুলবে! অর্থাৎ এদিনের মিছিল বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের লাগামহীন প্রত্যক্ষ বিদেশী পুঁজির বিনিয়োগ ও বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ব ক্ষেত্রকে বিলগ্নীকরণের নীতির বিরুদ্ধে শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রতিরোধের প্রাথমিক পদক্ষেপ।

এই মিছিল সমগ্র অংশের দেশপ্রেমিক জনগণের কাছে আহ্বান জানায় কেন্দ্রীয় সরকারের দেশ বিক্রির নীতির বিরুদ্ধে পথে নেমে বৃহত্তর লড়াই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে লুঠেরাদের হাত থেকে নিজেকে এবং নিজের দেশকে বাঁচানোর আন্দোলনে শামিল হওয়ার। □

ইজরায়েলী হামলার প্রতিবাদে পথে নামলেন রাজ্যের শ্রমিক-কর্মচারীরা

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ মদতে ইস্রায়েলী সেনাবাহিনীর পাশবিক আক্রমণে গাজা ভূখণ্ডে হাজার হাজার সাধারণ মানুষ এমনকি অসংখ্য শিশুর প্রাণহানি ঘটেছে। ২৩ জুলাই পর্যন্ত নিহত শিশুর সংখ্যা ১৫০০। রাষ্ট্রসংঘের হিসাব অনুযায়ী ২২০০ বাড়ি পুরোপুরি বিধ্বস্ত, অংশত বিধ্বস্ত বাড়ির সংখ্যা ২৭২০টি। ১৮টি চিকিৎসা কেন্দ্র বা হাসপাতাল এবং ৮৫টি স্কুল আক্রান্ত। সামগ্রিক পরিকাঠামো ভেঙে পড়েছে। জল প্রকল্পগুলি ইজরায়েলী বোমার আঘাতে ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় গাজার জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক অর্থাৎ ৯ লক্ষ মানুষ পানীয় জলের অভবে দিন কাটাচ্ছেন। শহরের পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থাও ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় সঙ্কট আরও তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠেছে। মার্কিন মদতপুষ্ট ইস্রায়েলী বাহিনীর এই আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কেন্দ্রের এন ডি এ সরকার নীরব। এমনকি আমাদের রাজ্য সরকারও নীরব দর্শকের ভূমিকায়। এই ঘটনায় তীব্র ধিক্কার জানিয়ে রাস্তায় নামলেন রাজ্যের সর্বস্তরের শ্রমিক কর্মচারী সমাজ।

২৫ জুলাই '১৪ অফিস ছুটির পর সি আই টি ইউ সহ সমস্ত বামপন্থী শ্রমিক সংগঠন, ১২ই জুলাই কমিটি, বি এস এন এল, ব্যাঙ্ক এমপ্লয়ীজ ফেডারেশনের উদ্যোগে শ্লোগান মুখরিত দৃপ্ত মিছিল কলকাতার রানী রাসমণি এভিনিউ থেকে শুরু হয়ে কলেজ স্ট্রিট পর্যন্ত যায়। এই মিছিলে স্লোগান ওঠে এই মুহূর্তে যদি ইস্রায়েলী হানাদারি বন্ধ না হয় তাহলে শ্রমিক কর্মচারী

(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে)

সংগ্রামী হাতিয়ার
আগস্ট ২০১৪
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র
৪৩তম বর্ষ □ চতুর্থ সংখ্যা □ মূল্য এক টাকা

সম্পাদকীয়

১০ সেপ্টেম্বর ২০১৪

রাজ্য সরকারের উপেক্ষা ও উদাসীনতার জবাব দিন

১০ সেপ্টেম্বর ২০১৪, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির ডাকে কেন্দ্রীয় সমাবেশ। একই সাথে কলকাতা ও শিলিগুড়িতে। পাঁচ দফা দাবিকে সামনে রেখে আহুত এই সমাবেশকে সফল করার জন্য রাজ্যজুড়েই প্রচার প্রস্তুতির কাজও চলছে জোরকদমে। যেভাবে সাড়া পাওয়া যাচ্ছে কর্মচারী বন্ধুদের কাছ থেকে, বুঝতে অসুবিধা হয় না দুটি সমাবেশই বিশাল সমাবেশে পরিণত হবে। সুবিশাল সমাবেশের আয়োজন করা রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কাছে কোন নতুন বিষয় নয়। অতীতে এমন বহু সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু এখন পরিস্থিতির চাহিদা একটু বেশিই। শুধুমাত্র শারীরিকভাবে অংশগ্রহণ করে সমাবেশে উপস্থিতির সংখ্যাবৃদ্ধি করা নয়, প্রয়োজন মুল কর্মসূচীর সাথে, তার দাবিগুলির সাথে, তার প্রতিটি প্রচার-প্রস্তুতিমুলক কর্মসূচীর সাথে মানসিক একাত্মতা গড়ে তোলা। এই দাবিগুলি আমাদেরই দাবি, এই সমাবেশ আমাদের স্বার্থেই হচ্ছে, এই যে প্রচার চলছে তা আমাদের জন্যই— এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে যদি সমস্ত বিষয়টাকে আমরা দেখি বা আমাদের সহকর্মীদের এইভাবেই ভাবাতে পারি, তাহলে বিপুল স্বতঃস্ফুর্ততা তৈরী হবে যার আজ বড় প্রয়োজন। ১০ সেপ্টেম্বর আমরা শুধু জনসমুদ্র চাই না, চাই স্লোগান মুখরিত উত্তাল ঢেউ তোলা জনসমুদ্র।

কারণ রাজ্য সরকার বধির। প্রতিদিন সংবাদ মাধ্যমে মন্ত্রী-সান্ত্রী-আমলাদের এত কথা, এত ছবি, এত অনুষ্ঠান, এত উৎসব—কিন্তু কোথাও রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের জন্য কোনও কথা নেই। এটা উপেক্ষা নয়? অপমান নয়? অথচ যে প্রশাসনের মাথায় তাঁরা বসে রয়েছেন, সেই প্রশাসনের মধ্যে কাজ করছেন কর্মচারীরা। প্রশাসনটাকে কি শুধুমাত্র মন্ত্রী-আমলারা চালাচ্ছেন? সচিবালয় থেকে শুরু করে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তর পর্যন্ত যে লক্ষাধিক কর্মচারী রয়েছেন, তাঁদের ভূমিকা ছাড়া প্রশাসন পরিচালনা করা সম্ভব? কিন্তু রাজ্য সরকারের এজেন্ডায় সেই কর্মচারীরাই ব্রাত্য!

অবশ্য ব্রাত্য বললে সত্যের অপলাপ করা হবে। রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা সরকারের এজেন্ডায় তখনই আসছেন, যখন তাঁদের কোন অর্জিত অধিকার কেড়ে নেওয়া বা সঙ্কুচিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। গত তিন বছরে এই ধরনের একাধিক আদেশনামা প্রকাশিত হয়েছে। যেগুলিতে চোখ বোলালেই বোঝা যায়, সরকারের কর্মচারীদের প্রতি মনোভাব কেমন। 'মা-মাটি-মানুষ'-এর স্লোগান দিয়ে এই সরকার ক্ষমতায় এসেছিল। তা মানুষের মধ্যে সরকারী কর্মচারীরা পড়েন না? তাঁরা কি মনুষ্যেতর কোন জীব? নাকি নির্বাচনের আগে সরকারী কর্মচারীরা মানুষ ছিলেন, এখন নন। নির্বাচনের বৈতরণী পার হবার জন্য আর সকলের সাথে, সরকারী কর্মচারীদের জন্যও অজস্র প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল। আর এখন সেগুলি বেমালুম ভুলে যাওয়া হচ্ছে। হাবেভাবে মনেই হচ্ছে না এই সরকার এই ধরণের কোন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কর্মচারীদের স্বীকৃত সংগঠনগুলির সাথে আলোচনায় বসা, তাদের কথা শোনা ইত্যাদি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হচ্ছে। সংবাদমাধ্যম এই বিষয়ে খুব বেশি প্রশ্ন করলে, একটাই অজুহাত ভাঙা রেকর্ডের মত শোনানো হচ্ছে— আগের সরকার দেউলিয়া করে গেছে, হাতে টাকা নেই। ধার শোধ করতেই বাকি সব রোজগার শেষ হয়ে যাচ্ছে ইত্যাদি, ইত্যাদি। তা ক্ষমতায় বসার আগে এগুলো জানা ছিল না? আগের সরকার কত ধার করেছে, তার জন্য কত সুদ দিতে হয়, এগুলো তো কোন গোপন দলিল নয়। প্রতিবছর বিধানসভায় তো সেগুলো পেশ করা হত। তাহলে তখন কেন বলা হল না যে, রাজ্যের আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ, আমরা ক্ষমতায় এসেও কর্মচারীদের কিছু দিতে পারব না। ক্ষমতায় আসার লোভে এই সৎসাহসটুকুও দেখাতে পারলেন না তাঁরা?

আর যাঁদের সম্পর্কে দোষারোপ করা হচ্ছে, তাঁরা তো ধার করে হোক আর যেভাবে হোক কর্মচারীদের দাবিগুলিকে মান্যতা দিতেন। সমস্যা হলে, না পারলে তাও বুঝিয়ে বলতেন। এমন উপেক্ষা তো ছিল না। আর দেশের অন্যান্য রাজ্য, যেখানে কর্মচারীদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া, বিশেষত মহার্ঘভাতার দাবি পূরণ হচ্ছে, সেখানকার সরকারগুলি ধার করে না? এমন কোন রাজ্য আছে যারা ধার না করেই সব কাজ করতে পারে? আর্থিক দিক থেকে সম্পূর্ণ স্ব-নির্ভর হবার সুযোগ কোন রাজ্যের রয়েছে? কেন্দ্রের কাছ থেকে বা বিভিন্ন সূত্র থেকে ঋণ না করে পরিকল্পনা বা পরিকল্পনা বহির্ভূত সমস্ত ব্যয়ই করতে পারবে এমন অবস্থা কোন রাজ্যের নেই। থাকলে রাজ্যের হাতে অধিক অর্থ ও ক্ষমতা দিতে হবে এই দাবি তোলার প্রয়োজন হত না। কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক পুনর্বিন্যাসের জন্য সারকারিয়া কমিশন গঠনের প্রয়োজনও হত না। যদিও সারকারিয়া কমিশনের সুপারিশ কার্যকরী করা হয় নি। তবে তা ভিন্ন প্রসঙ্গ। কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন রাজ্য থেকে রাজস্ব বাবদ যা আয় করে, তার মাত্র ৩১.৫ শতাংশ রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টন করে। যা যথেষ্ট নয়। তাই এই পরিমাণকে বৃদ্ধি করে ৫০ শতাংশ করার দাবি বামপন্থীরাই প্রথম তুলেছিল। পরবর্তীকালে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদে অন্যান্য রাজনৈতিক দল পরিচালিত সরকারও এই দাবিকে সমর্থন করেছে। মূল্যযুক্ত কর বা ভ্যাট চালু করার যে প্রস্তাব জাতীয়স্তরে এই রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষ থেকে করা হয়েছিল, তাও তো রাজ্যের আর্থিক শ্রীবৃদ্ধির জন্যই। ভারতের কোন রাজনৈতিক দলের কাছেই বিষয়গুলি অজানা নয়। এই রাজ্যের শাসকদলের কাছেও তখন (নির্বাচনের আগে) বিষয়গুলি অজানা ছিল না। তা সত্ত্বেও তখন কেন বাস্তবতার কথা স্বীকার করা হয় নি?

সর্বোপরি যাঁরা অহরহ পূর্বতন সরকারকে ঋণ করে যাওয়ার জন্য সমালোচনা করছেন, তাঁদের নিজেদের ঋণ করার বহরতো তাক লাগিয়ে দেওয়ার মতন। পূর্বতন সরকারের সময় ঋণীদের তালিকায় এই রাজ্য তো একনম্বরে ছিল না। আজ তো, এই রাজ্য তিন বছরে সবাইকে পেছনে ফেলে এক নম্বরে পৌঁছে গেছে। এই অগ্রগমন (না পশ্চাদগমন?) কাদের কৃতিত্ব? এমনকি এই অবস্থাতেও খরচের বহরতো কমছে না। কিন্তু যা খরচ হচ্ছে তার নব্বই শতাংশ চলে যাচ্ছে সিনেমা আর্টিস্ট আর বিভিন্ন ক্লাবের পকেটে এবং উৎসব আর মেলা করতে। সরকারী কর্মচারীরা দাবি করলেই যেন সরকারের মাথায় বাজ পড়ছে। কতদিন মানা যায় এই অবস্থা? আর আমরা চুপ করে থাকলে, হঠাৎ একদিন সরকারের বোধোদয় হবে আর আমাদের সব বকেয়া দাবি এমনি এমনিই পূরণ হয়ে যাবে, এমন কোন সম্ভাবনা নেই। তাছাড়া হাহুতাশ করে আর যাই হোক দাবি অর্জিত হয় না। দাবি অর্জন করতে হলে লড়তে হবে, রাস্তায় নেমে। সরকার যদি বোঝে, দাবি না মানলেও কর্মচারীদের প্রতিবাদ করার সাহসটুকু পর্যন্ত নেই। তাহলে সর্বনাশ। আক্রমণ আরও তীব্রতর হবে। ইতিহাসের শিক্ষা তাই। কিন্তু সরকার যদি দেখে, এত আক্রমণ করেও কর্মচারীদের দমানো যাচ্ছে না, তাহলে আমাদের দাবিগুলি নিয়ে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য হবে।

আগামী কর্মসূচীতে, শুধু দাবি তোলা নয়, সরকারকে বাধ্য করানোর তীব্রতা ও গতি আনতে হবে। আমাদের অতীত কিন্তু বলে আমরা পারব। শুধু দরকার বুকে একটু সাহস নিয়ে আসা। এই সাহসটা দরকার নিজের স্বার্থে, পরিবারের স্বার্থে। অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকরা পারছেন, আমরা পারবো না কেন? আমাদের শিক্ষা লব্ধ জ্ঞানের প্রকৃত পরীক্ষা তো এই সময়েই। আজকের পরিস্থিতিতে নীরবতা, গা বাঁচিয়ে চলার মানসিকতা ভয়াবহ বিপদ ডেকে আনবে। শুধুমাত্র বদলি আর প্রশাসনিক আক্রমণের ভয়ে নিজেদের গুটিয়ে রাখলে সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনটাই বিপন্ন হবে। কোন্‌টা শ্রেয় আমাদের কাছে? আপাত বদলি এড়ানো, নাকি সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনের গ্যারান্টি সৃষ্টি করা। আসুন নিজেরাই, নিজেদের কাছে প্রশ্নটা রাখি এবং উত্তর খুঁজে নিই। আর স্মরণ করি কবিগুরুকে—

'মুক্ত কর ভয়, আপনা মাঝে শক্তিধরো, নিজেরে করো জয়।' □

২২ আগস্ট, ২০১৪

শিল্প নয়, শিল্প চাই

আমরা নিশ্চিত, এই পত্রিকার প্রিয় পাঠকবৃন্দ উপরোক্ত শিরোনামটি দেখিয়া যারপরনাই চমকিত হইতেছেন। আপনাদিগের এবংবিধ প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক। কারণ 'শিল্প' নামক বিশেষ্য পদটিকে কেন্দ্রে রাখিয়া যুগপৎ ইতিবাচক ও নেতিবাচক অভিব্যক্তি আশ্চর্যান্বিত করিবার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু মদীয় রাজ্যের বিদ্যমান পরিস্থিতি এমন আপাতদৃষ্টিতে অস্বাভাবিক শিরোনাম নির্বাচনে আমাদের প্রতিনিয়ত প্ররোচিত করিতেছে। কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করিলেই পাঠকবৃন্দ উপলব্ধি করিবেন উপরোক্ত শিরোনামটি অস্বাভাবিক তো নয়ই, উপরন্তু বর্তমান পরিস্থিতির তাৎপর্য অনুধাবনে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য একটি শিরোনাম। আসুন, এক্ষণে আমরা ব্যাখ্যার প্রয়াস গ্রহণ করি।

বিগত তিন বৎসর যাবৎ রাজ্যপাট পরিচালনার মূল কক্ষপথে যাঁহারা অবস্থান করিতেছেন, এবং মূল কক্ষপথে না থাকিলেও, ছায়াপথে তাঁহাদের যাঁহারা অনুসরণ করিতেছেন, এমন বিশিষ্ট জনগণের মুখগহ্বর হইতে নিঃসৃত মণিমানিক্যের ন্যায় যে সমস্ত উদ্ধৃতি আমাদের কর্ণগোচর হইয়াছে, তাহা বঙ্গবাসীর আপাত নিঃস্তরঙ্গ জীবনে ক্ষণে ক্ষণে হিল্লোল তুলিয়াছে। সেগুলির সবিশেষ পুনরুল্লেখ করিয়া পাঠকবৃন্দের মূল্যবান সময় অপচয় করিবার কোনো প্রয়োজন রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু উক্ত মণিমানিক্য সুলভ উদ্ধৃতাবলীর অভ্যন্তর হইতে আমরা নির্বাচন করিতেছি উৎকৃষ্টতম দার্শনিক অভিব্যক্তি সমৃদ্ধ একটি উক্তিকে। যাহার পেটেন্ট রহিয়াছে মদীয় রাজ্যের একমেবাদ্বিতীয়ম বঙ্গেশ্বরীর হস্তে। তিনি তাঁহার দার্শনিকোচিত প্রজ্ঞায় যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা হইল, ইন্ডাস্ট্রি অর্থে 'শিল্প' এবং আর্ট অর্থে শিল্প এই দুই-এর মধ্যে কোনো প্রভেদ নাই। ফলত, কারখানা হউক বা না হউক নৃত্য, নাট্য বা সঙ্গীতের চর্চা হইলেই শিল্প হইতেছে মানিতে হইবে। অতিবাহিত তিনটি বৎসরে শিল্প অর্থে কারখানা গড়িবার জন্য পুঁজির তেমন দেখা নাই বলিয়া বিলাপ করিলে চলিবে না, কারণ ফি বৎসর একাধিকবার বলিউডী অভিনেতা শাহরুখ খান এই রাজ্যে উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে ধন্য করিতেছেন এবং তিনি যেহেতু অন্যতম জনপ্রিয় শিল্পী, সেহেতু তাঁহার আবির্ভাবই হইল শিল্প সূচনা এবং বিপুল পুঁজি বিনিয়োগের সমতুল্য। অর্থাৎ বুঝিয়া লইতে হইবে, শাহরুখ খান বা অমিতাভ বচ্চনের ন্যায় শিল্পীগণ যখনই বঙ্গভূমিতে পদার্পণ করিতেছেন তখনই একটি করিয়া বৃহৎ শিল্পোদ্যোগের দ্বারোদঘাটন হইতেছে। তাহা চক্ষুগোচর হইতেছে না বলিয়া, ঘটিতেছে না এমন নয়। পাঠকবৃন্দ ইহাও নিশ্চিত লক্ষ্য করিয়াছেন, বলিউডী অভিনেতা-অভিনেত্রীগণ যখনই কোনো রঙ্গমঞ্চে হাজির হইয়াছেন বা হইতেছেন, তখনই টলিউডী শিল্পীগণও সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের শিল্পকলা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ধরিয়া লইতে হইবে সেগুলি হইল বৃহৎ শিল্পের অ্যানসিলিয়ারি শিল্প! রতন টাটা মহাশয় বিশিষ্ট শিল্পপতি হইতেই পারেন, কিন্তু বঙ্গীয় শিল্পের নবরূপটি তিনি উপলব্ধি করিতেই পারেন নাই। ইহা তাঁহার ব্যর্থতা। যদি প্রকৃতই শিল্প সম্পর্কিত অশ্রুতপূর্ব দার্শনিক ব্যাখ্যাটি তাঁহার বোধগম্য হইত, তাহা হইলে বিমানবন্দর হইতে হোটেলে যাইবার কালে তিনি পথের দুই পারে চক্ষু মেলিয়া শিল্প খুঁজিবার জন্য বৃথা পণ্ডশ্রম না করিয়া, সরকারী এবং রাজনৈতিক স্তরে অনুসন্ধান করিলেই জানিতে পারিতেন বিগত তিন বৎসরে কয়েক শত উৎসব মঞ্চস্থ হইয়াছে এবং সেগুলিতে রূপালি পর্দার নায়ক-নায়িকাগণ নৃত্য-গীত প্রদর্শন করিয়াছেন, অর্থাৎ শয়ে শয়ে শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। 'টাটাবাবু' গোঁসা করিতে পারেন। কিন্তু উপায় নাই। বঙ্গেশ্বরী প্রণীত শিল্প সংজ্ঞায় টাটাবাবু, আম্বানি বাবুদের ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই। শিল্পতরী পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে অমিতাভ বচ্চন, শাহরুখ খান, মিঠুন চক্রবর্তী প্রমুখ 'শিল্পপতি'গণের সরব ও চলমান উপস্থিতিতে। এক্ষণে বঙ্গেশ্বরী সংজ্ঞায়িত শিল্প প্রসারের উদ্যোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে এবং সমগ্র প্রশাসনকে এহেন কর্মকাণ্ডে শামিল করিবার দৃষ্টিনন্দন দৃষ্টান্ত সম্প্রতি স্থাপিত হইয়াছে। জনৈক আইনরক্ষক স্বীয় বিভাগীয় একটি অনুষ্ঠানে 'ইউনিফর্ম' পরিহিত অবস্থাতেই অন্যতম বিশিষ্ট 'শিল্পোদ্যোগী' শাহরুখ খানের সহিত মঞ্চে নৃত্য করিলেন। অর্থাৎ ধরিয়া লইতে হইবে আইনরক্ষকগণও শিল্পোদ্যোগে ভূমিকা পালনে ব্রতী হইলেন। উক্ত বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত কতিপয় আধিকারিক আইন রক্ষকের ইউনিফর্ম পরিহিত অবস্থায় নৃত্য প্রদর্শনীতে আপত্তি ব্যক্ত করিয়াছেন বটে, তবে তাহা নিতান্তই বঙ্গপ্রদেশের নব-উত্থিত সরকারী সংস্কৃতি সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণেই। তাঁহারা যাহা বুঝিতে পারেন নাই, তাহা হইল বর্তমানে মদীয় রাজ্যে সমাজবিরোধীগণ অবাধ বিচরণ ও যা খুশি করিবার পারমিট লাভ করিয়াছে। স্বভাবতই আইন রক্ষকগণ কর্মহীন হইয়া পড়িয়াছেন। এমতাবস্থায় তাঁহাদের যদি শিল্পোদ্যোগে শামিল করা হয়, তাহা হইলে অন্যায় কোথায়? তাঁহারাও তো সরকারী প্রশাসনেরই অঙ্গ। নয় কি?

তথাপি, পাঠকবৃন্দ নব-শিল্পোদ্যোগের সংজ্ঞা ও পন্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সহমত না হইয়া, দুইটি সম্ভাব্য প্রশ্ন উত্থাপন করিতেই পারেন। এক—আর্ট অর্থে শিল্পকে, ইন্ডাস্ট্রি অর্থে শিল্পের সহিত বলপূর্বক এক করিয়া দেখাইলেও, উক্ত ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হইবে না। শাহরুখ খান নাচিলেই কি কর্মপ্রার্থী যুবক-যুবতীগণের কর্মসংস্থান হইবে? দুই—ইন্ডাস্ট্রি অর্থে শিল্পের জন্যও তো রাজ্য সরকার বিবিধ কসরৎ করিতেছে। বিভিন্ন জেলায় প্রস্তরখণ্ড প্রোথিত হইতেছে, প্রকল্প ঘোষিত হইতেছে, এমনকি বিদেশ ভ্রমণের প্রক্রিয়াও শুরু হইয়াছে। তাহা হইলে ইন্ডাস্ট্রি অর্থে শিল্পকে রাজ্য সরকার মান্যতা প্রদান করে না, একথা বলা অনুচিত হইবে।

উত্থাপিত দুইটি প্রশ্নেরই একটিই উত্তর এবং তাহা হইল 'সেফটি ভাল্‌ভ্‌। কর্মহীন যুবক-যুবতীগণের ক্ষোভকে প্রশমিত করিবার জন্যই ক্ষণে ক্ষণে নাচা-গানা ও তারকা সমাবেশ এবং প্রস্তরখণ্ড প্রোথিত হইতেছে, প্রকল্প ঘোষিত হইতেছে কিন্তু কোনোটিই সূর্যালোক প্রত্যক্ষ করিতেছে না। এমতাবস্থায় ব্যর্থতার তক্‌মা গা হইতে ঝাড়িয়া ফেলিবার জন্যই দুই শিল্পকে একত্রে মিশাইয়া চচ্চড়ি বানাইবার প্রচেষ্টা আর কি! ইংরাজী ভাষা লইয়া শিরঃপীড়ার কোন প্রয়োজন নাই। বাংলা ভাষায় যাহা 'শিল্প' তাহা যে হইতেছেই ইহা লইয়া কোন সংশয়ের অবকাশ থাকে না। □

৫ ভাদ্র, ১৪২১

শোক সংবাদ

মুকুল দে

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি, হুগলী জেলার প্রাক্তন সম্পাদক ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী সমিতি, হুগলী জেলার প্রাক্তন সভাপতি কমরেড মুকুল দে গত ২২ জুলাই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে নিজ বাসভবনে প্রয়াত হন। বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তাঁর এক পুত্র ও কন্যা বর্তমান।

১৯৫৪ সালের ১৪ ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চাকরিতে যোগ দিয়েই তিনি কর্মচারী আন্দোলন ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাথে যুক্ত হন।

প্রশাসনের বিষ নজরে পড়ে গ্রেপ্তার, মিথ্যা মামলা, মিসা, বদলী, হয়রানিমূলক বদলী কোনো কিছুই তাঁকে সংগ্রাম আন্দোলন থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি।

মৃত্যু পর্যন্ত তিনি পেনশনার্স সমিতির সাথে যুক্ত ছিলেন। প্রয়াত কমরেডের প্রতি শ্রদ্ধা জানান ও মাল্যদান করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে অন্যতম সহ-সভাপতি চুনীলাল মুখার্জী, হুগলীর প্রাক্তন সাংসদ রূপচাঁদ পালসহ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ। □

বিজয় চন্দ্র চক্রবর্তী

প্রয়াত হলেন পশ্চিমবঙ্গ খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ কর্মচারী সমিতির প্রাক্তন সভাপতি কমরেড বিজয় চন্দ্র চক্রবর্তী। গত ৩ জুন ২০১৪, সকালবেলা নিজ বাসভবনে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর।

১৯৪৪ সালের ৪ আগস্ট অবিভক্ত বাংলার ঢাকা জেলার ধামরাই গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। গত শতাব্দীর ছয়ের দশকের শুরু থেকেই তিনি বামপন্থী শ্রমিক আন্দোলন ও উদ্বাস্তু আন্দোলনের সাথে যুক্ত হন। ১৯৬৮ সালে খাদ্য দপ্তরে গ্রুপ-ডি পদে চাকুরিতে যোগদান করেন এবং প্রথম থেকেই সংগঠন আন্দোলনে অংশ নেওয়ার কাজ শুরু করেন। পরবর্তীতে ক্রমান্বয়ে সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটিতে, কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীতে, প্রচার সম্পাদক, সহ-সভাপতি এবং সভাপতি পদে নির্বাচিত হন। সাতের দশকের আধা ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাসের সময় তাঁকে শ্যামনগর এলাকা ছেড়ে চন্দননগরে গিয়ে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। পোস্টার লিখনে অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন কমরেড চক্রবর্তী। ২০০৪ সালে তিনি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী পেনশনার্স সমিতির কাজের সাথে নিজেকে যুক্ত করেন। তাঁর স্ত্রী ও দুই কন্যা বর্তমান।

গত ৩০ জুন ২০১৪, কলকাতার খাদ্যভবনের ৭নং শেডে অফিস ছুটির পর তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় শোকপ্রস্তাব পাঠ করেন সমিতির সভাপতি প্রলয় দত্ত রায়। সমিতি ও বিভিন্ন ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনের নেতৃবৃন্দ তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। স্মৃতিচারণা করে বক্তব্য রাখেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক দেবব্রত রায়, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক স্মরজিৎ রায়চৌধুরী এবং যুগ্ম-সম্পাদক অসিত ভট্টাচার্য। □

প্যালেস্তাইন—এক দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ইতিহাস

অরিন্দম ব্যানার্জী

বরফঠাণ্ডা যে কোল্ড স্টোরেজে আগে থাকত সব্জি, এখন সেখানেই ডাঁই করা মৃতের স্তূপ। কারণ, মর্গে আর জায়গা নেই। শিশু থেকে বৃদ্ধ, মাঝবয়সী থেকে সন্তানসম্ভবা সব এখানে সাদা-সাদা প্লাস্টিকে মোড়া লাশ। চুঁইয়ে পড়ছে রক্ত। ভিজে সপসপে মেঝে। তারই মধ্যে ঝাপসা চোখে অতি সাবধানে পা ফেলে চলেছেন এক স্বজনহারা প্যালেস্তাইনি। গাজার প্রত্যেক লাশই এখন ইতিহাস। সেখানে এখন মৃত্যুর সর্বগ্রাসী নৃত্য অব্যাহত। ইজরায়েলী আক্রমণে নিহতের সংখ্যা দুই হাজার ছুঁয়েছে। গত ৮ জুলাই থেকে গাজায় অমানবিক আগ্রাসন চালাচ্ছে ইজরায়েল। সেখানকার স্বাস্থ্য মন্ত্রকের বিবৃতি অনুসারে, এক একদিন নিহতের সংখ্যা ছাড়িয়ে যাচ্ছে ১০০-র ওপর। হতাহতদের সামলাতে চিকিৎসক নার্সদের হিমশিম খেতে হচ্ছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুসারে, গাজায় ইজরায়েলী অভিযান শুরু হওয়ার পর থেকে ২ লক্ষ ১৫ হাজার মানুষ নিজেদের বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন। প্রাণ রক্ষায় বহু মানুষ রাষ্ট্রসঙ্ঘ পরিচালিত স্কুলগুলিতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু সেখানেও তারা আক্রান্ত হচ্ছেন।

প্যালেস্তাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন (পি এল ও) অস্ত্র বিরতিতে হামাসকে সম্মত করিয়েছে। পি এল ও'র প্রেসিডেন্ট মাহামুদ আব্বাস এই বিষয়ে হামাসের প্রধান খালেদ মিশালের সঙ্গে কথাও বলেছেন। কিন্তু ইজরায়েল অস্ত্র বিরতি চায় না। তাই গাজায় হত্যালীলা থামার কোনো লক্ষণ নেই। গাজার জাবালিয়ার কামাল আদাওয়ান হাসপাতাল এবং আল-শিফা হাসপাতালে বর্তমানে তিল ধারণেরও স্থান নেই। শহরে খান ইউনুস অঞ্চলের মান এলাকাটি পরিণত হয়েছে ধ্বংসস্তূপে। পূর্ব রাফায় চলছে লাগাতার ইজরায়েলী বোমাবর্ষণ। মধ্য গাজার আল জাওয়াইদা এবং দিয়ের আল বালাহতে থেকে থেকেই আছড়ে পড়ছে ক্ষেপণাস্ত্র।

আক্ষরিক অর্থেই গাজা বর্তমানে প্রকাণ্ড এক ধ্বংসস্তূপ। ঠিক যেন প্রস্তরযুগে ফিরে গেছে অঞ্চলটি। উৎসবের দিনেও গাজায় রক্তের স্রোত বইয়েছে ইজরায়েল। এদিকে বিদ্যুতের অভাবে জলশোধন কেন্দ্র বন্ধ। গাজায় জলের অভাব। হাসপাতালে লোডশেডিং। জীবনদায়ী ব্যবস্থায় রাখা হয়েছে এমন আক্রান্ত মানুষেরা বর্তমানে চরম বিপন্ন। গাজায় মিশর এবং ইজরায়েল থেকেও কিছু বিদ্যুৎ আসে। কিন্তু ইজরায়েলী হামলায় সেই বিদ্যুৎ সংবহনের লাইনগুলিও এখন ভেঙে পড়েছে।

গাজায় সরকারীভাবে প্রকাশিত বিবৃতি অনুসারে, ইজরায়েলী আগ্রাসনে ৫,০০০ বাড়ি ধূলিসাৎ হয়েছে। ক্ষতি হয়েছে ২৬,০০০ বাড়ি এবং আবাসনের। গৃহহীন হয়ে পড়েছেন ২ লক্ষ মানুষ।

এদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী শিবির বরাবরের মতোই ইজরায়েলকে আড়াল করতে তৎপর। মুখে অথবা ওপর ওপর ইজরায়েলের নিন্দা করলেও তারা প্রকৃতপক্ষে জায়নবাদীদের বিস্তারবাদী নীতিরই সমর্থক। তাই সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তাদের দেয় সব রকমের সাহায্যও। এই কারণেই মার্কিন রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামা এবং বিদেশ সচিব জন কেরি বার বার প্রকাশ্যে বিবৃতি দিচ্ছেন, "ইজরায়েলেরও আত্মরক্ষার অধিকার আছে।"

গাজার প্রতিটি লাশ সাম্রাজ্যবাদের এই ঘৃণ্য ও আগ্রাসী ভূমিকার কথা আমাদের মনে করিয়ে দেয়।

প্যালেস্তাইনের কথা

১৯১৫ সালে প্যালেস্তাইন তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে। ব্রিটেনের প্রতিনিধি স্যার হেনরি ম্যাকমোহন আরব প্রতিনিধি শেরিফ হুসেনকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, প্যালেস্তাইন একটি আরব রাষ্ট্র হিসেবেই থাকবে। অথচ সেই ব্রিটেনই আবার ১৯১৭ সালের ২ নভেম্বর বালফোর ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে উল্টো পথে হাঁটল। তদানীন্তন জায়নবাদী আন্দোলনের নেতা ডঃ ওয়েইজম্যানকে প্যালেস্তাইন অঞ্চলে একটি ইহুদি জাতিরাষ্ট্র গড়ে তোলা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিল। সেই সময় ঐ অঞ্চলে ইহুদিদের জনসংখ্যা ছিল মাত্র ৭ শতাংশ। এই সময় থেকেই সংঘাতের সূত্রপাত। পরবর্তীতে অবিসংবাদী নেতা ইয়াসের আরাফত। ১৯৬৪ সালে সবগুলি গেরিলা সংগঠন মিলে তৈরি হয় প্যালেস্তাইন মুক্তি মোর্চা (পি এল ও)। ১৯৬৯ সালে পি এল ও-র সর্বাধিনায়ক নির্বাচিত হন আরাফত। এর পরবর্তীতে জন্মভূমি উদ্ধারের দীর্ঘ রক্তাক্ত সংগ্রামের পথ ধরে ১৯৯৪ সালের ১ এপ্রিল আরাফত এবং ইজরায়েলের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ইৎঝাক রাবিনের সফল আলোচনার মধ্য দিয়ে জর্ডন নদীর পশ্চিম তীরে ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক এবং গাজা খাড়ি অঞ্চলে প্যালেস্তিনীয় স্বায়ত্তশাসনের অধিকার চূড়ান্ত স্বীকৃতি লাভ করে।

গাজার কথা

পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর, দক্ষিণ-পশ্চিমে মিশর আর উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বে ইজরায়েল—এইরকম এক ভৌগোলিক অবস্থানে ছোটো একটি ভূখণ্ড হল প্যালেস্তাইনের গাজা স্ট্রীপ। মোট ১৮ লক্ষ মানুষের বাস এই ভূখণ্ডে। ছোট এলাকা হিসেবে জনঘনত্ব বেশ বেশি। ৮ জুলাই থেকে এখানকার ৩৬৫ বর্গ কিলোমিটার এলাকাতেই একনাগাড়ে আক্রমণ চালাচ্ছে ইজরায়েল। রাষ্ট্রসংঘের হিসেবে এখন অবধি এই আক্রমণে ৮০ শতাংশ অসামরিক ও নিরীহ মানুষ নিহত হয়েছে। তার মধ্যে এক তৃতীয়াংশ মহিলা ও শিশু। অথচ মালয়েশিয়ার বিমান ধ্বংস হওয়ার পর যে আমেরিকা ও তার সাঙ্গোপাঙ্গরা রাশিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিল তারাই আজ আশ্চর্যজনকভাবে চুপ! ইজরায়েলের বিরুদ্ধে তাদের কোনো সতর্কবার্তা নেই। যদিও কাদের ছোঁড়া ক্ষেপণাস্ত্রে ঐ বিমান ধ্বংস হল সেই বিষয়টি আজও অন্ধকারে। ঘোষণা হচ্ছে—এর জন্য রাশিয়াকে দিতে হবে চরম মূল্য, অথচ ইজরায়েলের এই জঘন্য মানবতাবিরোধী অভিযানের পরেও সেই একই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরা স্পিকটি নট।

কেন আমেরিকার এই ইজরায়েল প্রেম?

আমেরিকার ইজরায়েলের প্রতি এই অগাধ প্রেমের অন্যতম কারণ হল মধ্যপ্রাচ্যের বিপুল খনিজ তেলের ভাণ্ডার। মধ্যপ্রাচ্যে এশিয়া, ইওরোপ ও আফ্রিকা—এই তিন মহাদেশের সংযোগস্থলে ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূলে রয়েছে ইজরায়েল-প্যালেস্তাইন। অর্থাৎ এমন এক স্থানে ইজরায়েলের অবস্থান যেখান থেকে খুব সহজেই আরব দুনিয়ার তেলের ভাণ্ডারের উপর নজরদারি চালান সম্ভব। ৭০-এর দশকে তিনবার পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের মূল্য বাড়ায় আমেরিকার অর্থনীতির উপর চাপ বাড়ে। সেই থেকেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অভিপ্রায় ছিল মধ্যপ্রাচ্যের তেলের ভাণ্ডারের উপর একাধিপত্য কায়েম করা। অপর দিকে প্যালেস্তাইনকে গুঁড়িয়ে দিতে ইজরায়েলেরও মার্কিন সমরাস্ত্রের ঢালাও সরবরাহের প্রয়োজন ছিল। এ এক খুব সহজ দেওয়া-নেওয়ার নীতি। নিজেদের স্বার্থেই দু-দেশের মধ্যে প্রেম হয়ে গেল! দ্বিতীয় কারণটি হল ইহুদি জনগোষ্ঠীর চাপ। ইজরায়েলে যত সংখ্যক ইহুদি আছে, তার প্রায় সমসংখ্যক ইহুদির বাস মার্কিন দেশে। পাশাপাশি ইউরোপেও বেশ ভালো সংখ্যক ক্ষমতাবান ও প্রভাবশালী ইহুদির বসবাস রয়েছে। এই বিপুল সংখ্যক ইহুদি জনগোষ্ঠীর চাপও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইজরায়েল প্রীতির অন্যতম কারণ।

ভারতের ভূমিকা

গাজায় ইজরায়েলী আগ্রাসন নিয়ে ভারত সরকারের অবস্থান লক্ষণীয়। কেন্দ্রীয় সরকার এমনকি সংসদে গাজার ঘটনা নিয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করতে দিতেও রাজি হচ্ছে না। সরকারের নিজের স্পষ্ট অবস্থান তো দূরের কথা বিদেশমন্ত্রী-সহ মন্ত্রীরা যুক্তি দিচ্ছেন, ইজরায়েল ও প্যালেস্তাইন উভয়েই ভারতের 'বন্ধু', গাজার ঘটনা 'স্পর্শকাতর', বিদেশমন্ত্রক বিবৃতিতে বলেছে, 'উভয় পক্ষেরই সংযত থাকা উচিত'।

আপাত নিরীহ এই অবস্থান আসলে ভারতের বিদেশনীতিতে বড় রকমের পরিবর্তন। বিজেপি ক্ষমতায় বসার পরে বিদেশনীতিতে যে পরিবর্তন হবে, তা আন্দাজ করা কঠিন ছিল না। কিন্তু বড় তাড়াতাড়ি ইজরায়েল-মুখী অবস্থান সামনে চলে এলো। ৬৬ বছর ধরে প্যালেস্তাইনের মুখ্য প্রশ্ন হল ইজরায়েল প্যালেস্তাইনের বিপুল ভূখণ্ড দখল করে রয়েছে। ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক, গাজা, পূর্ব জেরুজালেম, গোলান হাইটসে ইজরায়েলের ন্যূনতম অধিকারই নেই। গাজা দীর্ঘসময় পর্যন্ত সরাসরি ইজরায়েলী সেনাবাহিনীর দ্বারা অধিকৃত ছিল। এখন স্বাধীন প্যালেস্তাইন অথরিটি গঠিত হবার পরে গাজার ওপরে ঘন ঘন সামরিক আক্রমণ চালানো হচ্ছে। গাজা থেকে প্যালেস্তাইনের অধিবাসীদের মেরে হটিয়ে দেওয়াই লক্ষ্য। গত কয়েক বছরে এই ধরনের আক্রমণে কয়েক হাজার প্যালেস্তিনীয় নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে বড় অংশই শিশু, মহিলা।

ভারত বরাবর প্যালেস্তাইনের পাশে থেকেছে। গান্ধীজীও প্যালেস্তাইনের মানুষের পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র ও ভূখণ্ডের পক্ষে সওয়াল করেছিলেন। নেহরু থেকে ইন্দিরা গান্ধীর সরকার আন্তর্জাতিক মঞ্চে প্যালেস্তাইনের পক্ষে দাঁড়িয়েছে বরাবর। অন্যদিকে, ১৯৪৮ থেকে ১৯৯১ ইজরায়েলের সঙ্গে ভারতের পূর্ণ কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল না। ১৯৫০-এ ভারত ইজরায়েলকে স্বীকৃতি দিলেও ১৯৯২-এ এসে ভারতে ইজরায়েলী রাষ্ট্রদূত পূর্ণ দূতাবাস তৈরি করতে পারেন। এই সময় থেকেই ইজরায়েলের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কেও পরিবর্তন আসতে থাকে। তার একটি কারণ ভারত সরকার নয়া উদারনীতির রাস্তা নেয়, যে পথে পশ্চিমী পুঁজির দাপটই মুখ্য উপাদান হয়ে যেতে থাকে। আন্তর্জাতিক ভারসাম্যের পরিবর্তনে ভারতের বিদেশ নীতিতেও মার্কিনমুখী প্রবণতা বাড়তে থাকে। আমেরিকার দৌত্যেই ইজরায়েলের সঙ্গেও ভারতের সম্পর্ক তৈরি হতে থাকে। তবে, ভারতের সঙ্গে ইজরায়েলের সম্পর্ক নতুন দিকে মোড় নেয় অটলবিহারী সরকারের আমলে। ২০০২-এ ইজরায়েলের বিদেশমন্ত্রী সাইমন পেরেজ নয়াদিল্লী সফরে আসেন। এই সফরকে উভয় দেশই অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়। ভারতের তদানীন্তন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ব্রজেশ মিশ্র তত্ত্ব হাজির করেন : সন্ত্রাসবাদের হাতে অভিন্নভাবে আক্রান্ত আমেরিকা, ইজরায়েল ও ভারত, সুতরাং এই তিন দেশের একসঙ্গে লড়াই করা উচিত। এই সূত্রায়ন থেকেই ইজরায়েল-ভারত সম্পর্কের বিন্যাস বদলে যেতে থাকে। প্যালেস্তাইন প্রশ্নকে সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে এক করে ফেলে ইজরায়েলের যাবতীয় অমানবিক কুকীর্তিকে প্রশ্রয় দেবার একটি প্রবণতা ভারতের সরকারী নীতিনির্ধারণের জগতেও জায়গা পেতে থাকে। ভারত ক্রমশ ইজরায়েলের সামরিক সরঞ্জামের বড় ক্রেতা হয়ে ওঠে। ইজরায়েলের বৃহত্তম তিন অস্ত্র উৎপাদক — ইজরায়েলী আর্মস ইন্ডাস্ট্রি, ইজরায়েল মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রিজ এবং রাফায়েল ভারতে বড় বরাত পেয়েছে। গত দশ বছরে ভারত ইজরায়েল থেকেই সবচেয়ে বেশি সামরিক সরঞ্জাম কিনেছে। এই সংস্থাগুলি বরাত পেতে উৎকোচ দেওয়ায় কালো তালিকাভুক্তও হয়েছে। প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত এই সম্পর্ক ইজরায়েলের সঙ্গে ভারত সরকারের সম্পর্ক পরিবর্তনের অন্যতম বড় উপাদান।

নরেন্দ্র মোদি সরকার ক্ষমতায় আসার আগেই এক নিবন্ধে বিশিষ্ট সাংবাদিক সুকুমার মুরলীধরন দেখিয়েছিলেন, হিন্দুত্ববাদী মতাদর্শের সঙ্গে উগ্র জায়নবাদী মতাদর্শের নৈকট্য খুবই গভীর। আর এস এস-র তাত্ত্বিক নেতা গুরু গোলওয়ালকার লিখেছিলেন—ইহুদিরা তাদের জাতি, ধর্ম, সংস্কৃতি, ভাষা সবই রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছে; তাদের জাতীয়তা সম্পূর্ণ করতে শুধু দরকার একটি স্বাভাবিক ভূখণ্ড। প্যালেস্তাইনের জমি দখল করে এই তথাকথিত 'ভূখণ্ড'-ই ইজরায়েল। গোলওয়ালকার যেমন হিটলারের অনুরাগী ছিলেন তেমনই জায়নবাদী মতাদর্শকেও সম্ভ্রম করতেন। অভিন্ন সূত্রটি হল মুসলিম-বিদ্বেষ। গোলওয়ালকার ভারতে 'হিন্দু রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠা করে মুসলিমদের যেভাবে দেখতে চাইতেন, ঠিক সেভাবেই আরব ও প্যালেস্তিনীয়দের দেখে থাকে ইজরায়েল।

গাজায় সাম্প্রতিক আক্রমণের সময়ে নজিরবিহীনভাবে ভারতের সংবাদমাধ্যমে, সোস্যাল মিডিয়ায় ইজরায়েলের হয়ে সাফাই গাওয়া হচ্ছে। স্তম্ভলেখকদের কেউ কেউ এমনও লিখছেন, পশ্চিম এশিয়ায় ইজরায়েল একমাত্র 'গণতান্ত্রিক' দেশ, নিরাপত্তার প্রশ্নে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখাই ভারতের জাতীয় স্বার্থবাহী, কাজেই সহানুভূতির বদলে স্বার্থপর সিদ্ধান্ত নেওয়াই ভারতের পক্ষে উচিত হবে। লেখক চেতন ভগত নিজের টুইটারে লিখেছেন, সন্ত্রাসবাদীদের এভাবেই শিক্ষা দেওয়া উচিত। এইসবই হল এক পরিকল্পিত মতবাদিক প্রচার। মার্কিন পাঠশালায় এই শিক্ষা দেওয়া হয়। ইতিহাসের পুরো কাহিনী, ঘটনাপরম্পরা, ইজরায়েলের অভ্যন্তরীণ বাস্তবতা, ইজরায়েলের সন্ত্রাসবাদী নেটওয়ার্কের সমস্ত বিষয়কে আড়ালে রেখে জায়নবাদের পক্ষে ভারতের জনমতকে টেনে আনার চেষ্টা চলছে। প্যালেস্তাইন প্রশ্নকে 'মুসলিম প্রশ্ন' হিসেবে দেখানোর চেষ্টাও চলছে।

তবে প্যালেস্তাইন প্রশ্ন শেষপর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদী নকশারই ব্লু প্রিন্ট। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা

(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমে)

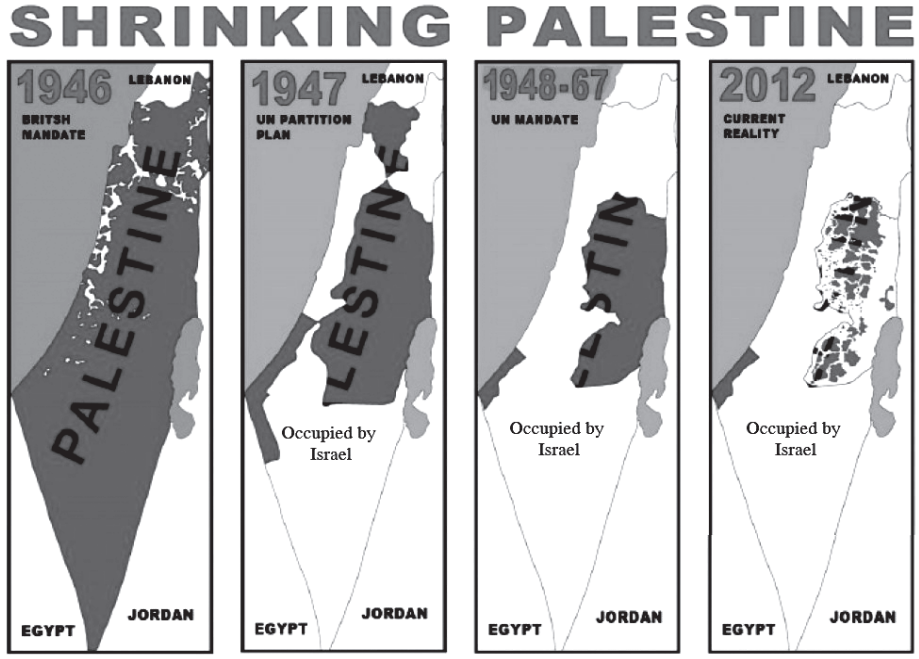

বহুমাত্রিক সাংগঠনিক উদ্যোগ

গণডেপুটেশন

পশ্চিমবঙ্গ খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ কর্মচারী সমিতির ডাকে বকেয়া মহার্ঘ ভাতা প্রদান, মৃত কর্মচারীর পোষ্যের চাকরি, কর্মচারীদের নিয়মিত প্রমোশন, হয়রানিমূলক বদলি রদ প্রভৃতি ১০ দফা দাবিতে ৪ আগস্ট, ২০১৪ খাদ্য ভবনে কর্মচারী সমাবেশ করে খাদ্য কমিশনারের নিকট গণডেপুটেশনের কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

দীর্ঘদিন ধরে খাদ্য দপ্তরে প্রশাসনের এক কালা আদেশনামা অনুযায়ী টিফিনের সময় মিটিং, মিছিল, জমায়েত, ঘরে ঘরে

স্কোয়াড প্রভৃতি ট্রেড ইউনিয়ন কর্মসূচী বন্ধ ছিল। সেই কালা আদেশনামাকে উপেক্ষা করেই এই গণটেপুটেশন কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়। সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গণডেপুটেশনের কর্মসূচী গ্রহণ করার সাথে সাথে দীর্ঘ ১০ দিন ধরে খাদ্য দপ্তরের প্রতিটি অফিসে টিফিনের সময় সাধারণ সভা করা হয়। সাধারণ সভাগুলিতে ৪ আগস্ট-এর গণ ডেপুটেশনের দাবিগুলি কর্মচারীদের কাছে তুলে ধরা হয়। দীর্ঘদিন বাদে কালা সার্কুলার উপেক্ষা করে এই সাধারণ সভাগুলি অনুষ্ঠিত হয়। সভাগুলিতে কর্মচারীদের উৎসাহ ও যোগদান ছিল চোখে পড়ার মতো। গণ-ডেপুটেশনের কর্মসূচীর আগের দিন ৩ আগস্ট টিফিনের সময় খাদ্য দপ্তরের প্রতিটি অফিসে একই সাথে পুনরায় সংক্ষিপ্ত প্রচার সভা হয়।

৪ আগস্টের গণডেপুটেশনের কর্মচারী সমাবেশে দাবি পেশ করেন পশ্চিমবঙ্গ খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ কর্মচারী সমিতির কেন্দ্রীয় যুগ্ম-সম্পাদক উৎসর্গ মিত্র। সমর্থনে বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক দেবব্রত রায়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি প্রলয় দত্ত রায়। এই গণডেপুটেশনের কর্মচারী সমাবেশে দুই শতাধিক কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। এই সমাবেশে কর্মচারীর উপস্থিতি ও উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

গণতান্ত্রিক ভাবে অনুষ্ঠিত এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হলেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে সমাবেশ স্থলে সকাল থেকেই প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয় যা ছিল অত্যন্ত দৃষ্টিকটু। প্রশাসনের এই আক্রমণাত্মক আচরণ উপেক্ষা করেই বিশাল কর্মচারী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশের পর কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর এক প্রতিনিধিদল খাদ্য দপ্তরের এডিশ্যানাল সেক্রেটারির নিকট দাবি সনদ পেশ করেন। দীর্ঘ এক ঘণ্টা ধরে প্রতিটি দাবি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। প্রশাসনের পক্ষ থেকে দাবিগুলির যৌক্তিকতা মেনে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। দীর্ঘ ১৫ দিন ধরে ধারাবাহিক ভাবে অফিসে অফিসে প্রচার ও কর্মচারীর জমায়েতের চাপেই প্রশাসন এই ডেপুটেশন গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে বলেই সমিতি মনে করে। প্রশাসনের দেওয়া প্রতিশ্রুতি যাতে কার্যকরী হয় সে বিষয়ে সমিতি নিয়মিত নজর রাখবে এই বক্তব্যও ডেপুটেশনে পেশ করা হয়। □

জ্যোতির্ময় দত্ত

সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অন্তর্ভুক্ত অন্যতম সংগঠন **পশ্চিমবঙ্গ ডাইরেক্টরেট এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশনের** হীরক জয়ন্ত বর্ষে গত ৩ আগস্ট, ২০১৪ রবিবার, বেলা ১২টায় মহাকরণ ক্যান্টিন হলে প্রতি বছরের মতো এবারেও ২০১৪ সালে মাধ্যমিক / উচ্চ মাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সদস্যদের পুত্র / কন্যাদের সমিতির পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়।

এই পারিবারিক মিলনোৎসবে ৫০ জন শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবক সহ মোট ২৪৬ জন উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি চিত্তরঞ্জন মণ্ডল। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে শিক্ষার্থীদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সঙ্গে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণের উপর জোর দেন সংগ্রামী হাতিয়ারের সম্পাদক সুমিত ভট্টাচার্য। সমিতির সাধারণ সম্পাদক বিদ্যুৎ চ্যাটার্জী উপস্থিত সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠা অর্জনের ক্ষেত্রে এদিনের সভার সম্মিলিত শুভেচ্ছার বিষয়টি উল্লেখ করেন। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির যুগ্ম-সম্পাদক অসিত ভট্টাচার্য উচ্চশিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে সাধারণ ও আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া ঘরের শিক্ষার্থীদের ন্যূনতম সুযোগের অপ্রতুলতার বিষয়টি উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠানে ভূমিলেখ্য

পরিমাপ অধিকারের সহকর্মী সমরেশ চ্যাটার্জীর কন্যা ও এই অনুষ্ঠানের সম্বর্ধনা প্রাপক সুচিস্মিতা চ্যাটার্জী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মুক্তি' কবিতাটি আবৃত্তি করেন। কাঞ্চনজঙ্ঘা শৃঙ্গজয়ী দীপঙ্কর ঘোষের দুঃসাহসিক অভিযানের স্লাইড শো সকলের প্রশংসা কুড়ায়। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে শিক্ষার্থীদের হাতে সংশাপত্র ও উপহারস্বরূপ পুস্তক তুলে দেন সমিতির ও রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রাক্তন ও বর্তমান নেতৃবৃন্দ।□

রাইটার্স বিল্ডিংস গ্রুপ-ডি কর্মচারী সমিতির সদস্য / সদস্যাদের মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পুত্র-কন্যাদের সম্বর্ধনা ও সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ৩ আগস্ট ২০১৪ বেলা ২টায় কর্মচারী ভবনে (অরবিন্দ সভাকক্ষ) এক মিলন মেলার রূপ পেল।

সভাপতিমণ্ডলীর সদস্যবৃন্দ, যথাক্রমে শংকর চক্রবর্তী, সোমনাথ ঘোষ, রেখা দাস ও পার্থ দত্ত এই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য লিটন পান্ডে। সাধারণ সম্পাদক অভিজিৎ বোস বর্তমান পরিস্থিতির মূল্যায়ণ করে ছাত্র-ছাত্রীদের বলিষ্ঠ পদক্ষেপে জীবন সংগ্রামে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। তিনি সকলকে এই মহতী অনুষ্ঠানে আসার জন্য স্বাগত জানান। লিটন পান্ডে এই অনুষ্ঠানের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বৃহত্তর সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা স্মরণ করিয়ে দেন। ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দীপ্ত করে

তাঁর মূল্যবান বক্তব্য। তিনি ১০ সেপ্টেম্বর ডি এ সহ ৫ দফা দাবিতে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির আন্দোলনে পরিবার পরিজন যাতে শামিল হয় তার আহ্বান জানান।

এই মনোগ্রাহী অনুষ্ঠানে পরিবার-পরিজন সহ কর্মচারীদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য। কচি কাঁচাদের গান ও আবৃত্তি অনুষ্ঠানটিকে মাতিয়ে তোলে। তাদের অংশগ্রহণ অনুষ্ঠানটিকে ভিন্নতর স্বাদ এনে দেয় ও সর্বাঙ্গ সুন্দর করে তোলে। ব্যতিক্রমী এক মাত্রা এনে দেয়।

মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ১২ জন, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ১১ জন সহ মোট উপস্থিত ছিলেন ১২৫ জন। □

রক্তদান

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির রাজ্য কাউন্সিল সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গত ৭ আগস্ট ২০১৪, **পূর্ব মেদিনীপুর জেলা শাখার** উদ্যোগে কাঁথি মহকুমার সমিতিভবনে এবং জেলা কর্মচারী ভবনে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। দুটি রক্তদান শিবিরে যথাক্রমে কাঁথিতে ৬১ জন এবং তমলুকে ২৯ জন রক্তদাতা রক্ত দান করেন। এই রক্তদান কর্মসূচীতে কাঁথিতে ১৮০ জন কর্মচারী এবং তমলুকে ১৫০ জন কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

কাঁথি রক্তদান শিবির উদ্বোধন করেন জেলা কমিটির অন্যতম সহ-সম্পাদক দেবকুমার চক্রবর্তী। সভা পরিচালনা করেন বেলা খাতুন ও সুভাষ মান্না। বক্তব্য রাখেন অনল দাস, মহকুমা সম্পাদক কাঁথি এবং দুলাল খাঁড়া, মহকুমা সম্পাদক এগরা মহকুমা। তমলুকের সভা পরিচালনা করেন আশিষ দাস। উদ্বোধন করেন শ্যামল সরকার, জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক গোবিন্দ চক্রবর্তী।

কাঁথি মহকুমার রক্তদান শিবিরে এগরা মহকুমার কর্মচারী বন্ধুরা এবং জেলা সদরের কর্মসূচীতে হলদিয়া মহকুমার কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।□

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি, বাঁকুড়া জেলা শাখার উদ্যোগে রক্তদান শিবির উপলক্ষ্যে ১৪ আগস্ট, ২০১৪ সভার উদ্বোধন করেন ১২ই জুলাই কমিটির অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক পার্থ ঘোষ। তিনি সংগঠনের উদ্যোগে রক্তদানের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে, এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক কর্মকাণ্ডে কর্মচারীদের আরো বেশি অংশগ্রহণের আহ্বান জানান। এছাড়া সভায় বক্তব্য রাখেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির জেলা সম্পাদক অতনু মজুমদার। সভা পরিচালনা করেন ধর্মদাস ঘটক, রত্না সরকার ও সুনীল বাসুলীকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। সভা শেষে রক্তদান কর্মসূচী শুরু হয়। প্রথমে জেলা সম্পাদক সহ তিনজন সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য রক্তদান করেন। পরে কর্মী নেতৃত্বরা রক্তদান করেন। সর্বমোট ৩০ (ত্রিশ) জন রক্তদাতা রক্তদান করে কর্মসূচীকে সাফল্যের শীর্ষে নিয়ে যান। শিবিরে একশত জন কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য একইভাবে আগামী ৩০ আগস্ট, ১৪ খাতড়া মহকুমা এবং ৭ সেপ্টেম্বর, ১৪ বিষ্ণুপুর মহকুমায় রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বে রক্তদান কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হবে। □

পোস্টার লিখন কর্মশালা

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি কলকাতা দক্ষিণ অঞ্চলের উদ্যোগে ১৯ আগস্ট অঞ্চল দপ্তরে হাতে লেখা পোস্টারের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মশালায় অঞ্চলের ১৬ জন কর্মী দীর্ঘ সময় ১০ সেপ্টেম্বর '১৪ পাঁচ দফা দাবিতে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় বিক্ষোভ সমাবেশ এবং মুখ্যমন্ত্রীর নিকট দাবিপত্র পেশ এর কর্মসূচী সম্পর্কিত পোস্টার লেখেন। দেড় শতাধিক পোষ্টার অঞ্চলের ১০টি সেক্টরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আগামী ৩ সেপ্টেম্বর '১৪ অঞ্চলের প্রতিটি দপ্তরে কর্মচারী জমায়েতের মাধ্যমে হাতে লেখা পোস্টার লাগানোর কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হবে। □

আলোচনা সভা

গত ১ জুলাই, ২০১৪ তারিখে **ওয়েস্ট বেঙ্গল নন-মেডিক্যাল টেকনিক্যাল এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশনের** উদ্যোগে 'বর্তমান পরিস্থিতি ও আমাদের কর্তব্য' শীর্ষক কেন্দ্রীয় আলোচনা সভা কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল ট্রাষ্ট সভাকক্ষে কলকাতা সহ পার্শ্ববর্তী জেলার ব্যাপক কর্মচারী জমায়েতের মধ্য দিয়ে সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়। কুণাল রায়ের সভাপতিত্বে প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক শান্তনু ভট্টাচার্য্য। 'বর্তমান পরিস্থিতি ও আমাদের কর্তব্য' শীর্ষক আলোচনা সভার আলোচক কর্মচারী আন্দোলনের প্রবীণ নেতৃত্ব প্রণব চট্টোপাধ্যায় সহজ ভাষায় বস্তুনিষ্ঠ বক্তব্য রাখেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন বিগত লোকসভা নির্বাচনে যে দল একক ভাবে সংসদে গরিষ্ঠতা পেয়েছে তার পেছনে কর্পোরেটদের ভূমিকা ও সাম্প্রদায়িকতার বিপদ সহ বাজার মৌলবাদ এবং সাম্প্রদায়িক মৌলবাদ দেশে সমূহ বিপদ ডেকে আনছে। পাশাপাশি মধ্যবিত্ত সমাজের উপর ব্যাপক আক্রমণ প্রসঙ্গও তিনি উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন, বর্তমান কঠিন পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করতে পারে মজবুত সংগঠন। সংগঠনকে মজবুত করে গড়ে তোলাই বর্তমান সময়ের চাহিদা। প্রায় দুই শতাধিক কর্মচারী বন্ধুদের উপস্থিতিতে আলোচনাসভা সম্পন্ন হয়। □

জাতীয় দাবি দিবসের পাঁচ দফা দাবি

১। পি এফ আর ডি এ অনুযায়ী প্রণীত জাতীয় পেনশন প্রকল্প প্রত্যাহার কর এবং চাকুরিতে যোগদানের সময় নির্বিশেষে সমস্ত কর্মচারীকে প্রচলিত বিধিবদ্ধ পেনশন ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে এসো। ২। স্থায়ী নিয়োগের মাধ্যমে সমস্ত শূন্যপদ পূরণ করো; চুক্তি প্রথায় নিয়োগ বাতিল করো এবং বেসরকারীকরণ রদ করো। ৩। সমস্ত অস্থায়ী, সাময়িক, চুক্তি ভিত্তিক এবং প্রতিষ্ঠান-বহির্ভূত (আউট সোর্সিং) কর্মচারীদের নিয়োগকে স্থায়ী নিয়োগে পরিণত কর। ৪। শ্রম আইনের কঠোর প্রয়োগ সুনিশ্চিত করো এবং শ্রমিক-কর্মচারী স্বার্থেই শ্রম আইনের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করো। ৫। সপ্তম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনের সুপারিশ কার্যকরী করার বিষয়টি সুনিশ্চিত করো এবং এই সুবিধা রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের জন্যও প্রসারিত করো। □

কমরেড সুশীল দাসকে শ্রদ্ধায় স্মরণ

রাজ্য সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের প্রবীণতম নেতা, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি গঠন পর্বের অন্যতম সংগঠক, পশ্চিমবঙ্গ সেক্রেটারিয়েট এমপ্লয়ীজ এ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী পেনশনার্স সমিতির প্রাক্তন সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও উপদেষ্টা কমরেড সুশীলকুমার দাস গত ৫ জুলাই ২০১৪ প্রয়াত হয়েছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৯৩ বছর। প্রয়াত এই নেতার স্মরণে পশ্চিমবঙ্গ সেক্রেটারিয়েট এমপ্লয়ীজ এ্যাসোসিয়েশন ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী পেনশনার্স সমিতির যৌথ উদ্যোগে গত ২৩ জুলাই, ২০১৪ কলকাতার কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল হলে এক স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে বিভিন্ন সংগঠনের প্রাক্তন ও বর্তমান কর্মী-নেতৃত্বের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতিতে এই স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার প্রারম্ভে প্রয়াত নেতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে তার প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে সভার কাজ শুরু হয়। আয়োজক সংগঠনদ্বয়, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি, উপস্থিত বিভিন্ন সংগঠনগুলি ও কলকাতার রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অঞ্চলগুলি সহ বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ এবং পরিবারের পক্ষ থেকে মাল্যদান করা হয়। এ ছাড়াও কমরেড দাসের সংগ্রাম-আন্দোলনে বহুমুখীন পদচারণা ও সামাজিক ক্ষেত্রের

সুজিত দাস

দায়িত্বশীল ভূমিকা উল্লেখ করে একটি শোক প্রস্তাব সভায় উত্থাপন করা হয়।

কমরেড দাসের সংগ্রামী জীবনের বিভিন্নমুখীন কর্মধারা নিয়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে বক্তব্য রাখেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক মনোজ কান্তি গুহ, পশ্চিমবঙ্গ সেক্রেটারিয়েট এমপ্লয়ীজ এ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মিলন দাস, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী পেনশনার্স সমিতির সাধারণ সম্পাদক অজয় সেন, কমরেড দাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুজিত দাস এবং প্রয়াত নেতার সংগ্রাম আন্দোলনের দীর্ঘদিনের সাথী কর্মচারী আন্দোলনের প্রবীন নেতা অজয় মুখোপাধ্যায়।

স্মরণসভার কাজ পরিচালনা করেন পশ্চিমবঙ্গ সেক্রেটারিয়েট এমপ্লয়ীজ এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অশোক ঘোষ ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী পেনশনার্স সমিতির সহ-সভাপতি সুবল রায়কে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। □

১০ সেপ্টেম্বর ২০১৪ পাঁচ দফা দাবিতে

রচিত হবে ইতিহাসের নতুন অধ্যায়

অসিত কুমার ভট্টাচার্য
যুগ্ম-সম্পাদক, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি

রাজ্য সরকারী কর্মচারী সমাজ আজ এক ভয়ঙ্কর অবস্থার মুখোমুখি। রাজ্য সরকারী কর্মচারী সমাজের মধ্যে কেবল আমরাই নই, আছেন বোর্ড, কর্পোরেশন, পঞ্চায়েত, রাজ্য সরকার নিয়ন্ত্রিত সংস্থা, শিক্ষক, অশিক্ষক কর্মচারী সকলেই—যাঁদের নিয়োগ কর্তা রাজ্য সরকার। এই দারুণ দুর্মূল্যের বাজারে রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা ৪২% মহার্ঘভাতা থেকে বঞ্চিত। পুরনো বেতন কমিশনের (৫ম) কর্মচারী স্বার্থবাহী সুপারিশসমূহ নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্য নেই। এক অসহনীয় নীরবতা নতুন বেতন কমিশন সম্পর্কে। এর সঙ্গে জুড়েছে সারা রাজ্য জুড়ে প্রশাসনের অভ্যন্তরে ত্রাস সৃষ্টিকারী এক দমবন্ধ করা পরিবেশ। দাবি-দাওয়া, অভাব-অভিযোগ, সমস্যা, যন্ত্রণা নিয়ে স্পষ্ট, প্রকাশ্য এবং শংকাহীন মত প্রকাশের কোনো পরিস্থিতি নেই। ক্ষোভ, অসন্তোষ প্রকাশ করলে, সরকারের অবাঞ্ছিত সিদ্ধান্তের প্রত্যক্ষ বিরোধিতা বা প্রতিবাদ করলে যে কোনো দপ্তরের কর্মচারী / আধিকারিক যে কোনো মুহূর্তে বদলী হয়ে যেতে পারেন যে কোনো জায়গায়। এমনকি অন্য দপ্তরে ডেপুটেশনও পাঠানো হতে পারে। গ্রামীণ এলাকা হলে কর্মচারী চিহ্নিত করে শারীরিক নির্যাতন, জরিমানাও দিতে হতে পারে। ছা-পোষা সরকারী কর্মচারী, পড়াশোনা করা ছেলেমেয়ে, অসুস্থ মা-বাবাকে রেখে কোথায় নির্বাসন হবে, কবে ফের দেখা হবে কেউ জানে না। ফলে প্রশাসন, পুলিশ এবং আমলাতন্ত্র আরও বল্গাহীন, বেপরোয়া এবং স্বৈরাচারী।

অথচ গণতন্ত্র আর উন্নয়ন এর শ্লোগান দিয়ে রাজ্যে পরিবর্তনের ঢেউ তুলে ৩৮ মাস আগে ক্ষমতাসীন হয় এই সরকার। অনেক স্বপ্ন, অজস্র প্রতিশ্রুতি আর রঙীন কল্পনাজালে মানুষকে জড়িয়ে রাজ্যের শ্রমিক কর্মচারী সমাজের কাছে যে ছবি হাজির করা হল তা ধীরে ধীরে বিলীন, কথার কথা আর বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে কেন? এক গভীর হতাশা, তীব্র ক্ষোভ আর অবদমিত অপমান বোধ, লাঞ্ছনা শ্রমিক-কর্মচারীদের গ্রাস করছে কেন তা গভীরভাবে ভাবা দরকার আমাদের। সত্যি সত্যিই কি বর্তমান রাজ্য সরকারের নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গী পশ্চিমবাংলার শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রতি অনুকূল এবং দরদী নাকি এর পেছনে কোনো ভান, প্রতারণা লুকিয়ে আছে? বিভ্রান্তি আর মিথ্যার মায়াজলে জড়ানো হয়েছে শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষক-মধ্যবিত্তসহ সমগ্র মেহনতী জনগণকে, মানুষকে অন্দোলন বিমুখ করতে, নতজানু করতে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার এ কি কোনো কৌশল? গত ৩৮ মাসের ঘটনাবলী, ঘটনাবলীর গতিমুখ যে দিকে এগোচ্ছে তা বিচার বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে আমাদের। পরিস্থিতির হাতে নিজেদের সমর্পণ করলে আমরা এ থেকে মুক্তি পাব না, সমস্যার—যন্ত্রণার অবসান ঘটবে না। পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েই বুঝে নিতে হবে আমাদের। 'Not to understand is to Perish', নতুবা ধ্বংস হয়ে যাবে আমাদের অস্তিত্ব।

"পশ্চিমবঙ্গে সরকারী কর্মচারীদের অবস্থা অন্যান্য ক্ষেত্রগুলোর মতোই শোচনীয়। ফিফথ পে-কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করা এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। ওটা শেষ করে সিক্সথ পে-কমিশনকেও আপ-টু-ডেট করতে হবে। এক্ষেত্রে ২০০৬ থেকে মার্চ ২০০৮-এই ২৭ মাসের বেতন সরকার কোনোভাবেই দিতে রাজী নয়। এটা অবশ্যই দিতে হবে। এছাড়া সরকারী ক্ষেত্রে সাড়ে তিন লক্ষ শূন্যপদ আছে। এখানে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লোক নিয়োগ হলে সাড়ে তিন লক্ষ বেকার যুবকের চাকরি নিশ্চিত। এর পাশাপাশি ঐ সাড়ে তিন লক্ষ শূন্য পদে লোক নিয়োগ হলে চাকরিরত সরকারী প্রোমোশন হতে পারে, যা বছরের পর বছর আটকে আছে।

সরকারী কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা আপ-টু-ডেট হয়নি। সর্বোপরি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যাতায়াত ভাতা না থাকায় অন্য রাজ্যের তুলনায় এ রাজ্যে বেতন প্রায় অর্ধেক।" (পঞ্চদশ লোকসভা নির্বাচন, ২০০৯, নির্বাচনী ইস্তাহার, সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস, পৃঃ-৪৯)

"...সরকারী কর্মীদের স্বার্থ সুরক্ষিত থাকবে। তাঁদের দীর্ঘদিন যেসব বক্তব্য উপেক্ষিত ছিল, যেসব বঞ্চনা দীর্ঘদিন তাঁরা সহ্য করেছেন, গোটা বিষয়টি যথাযথভাবে বিবেচনার মাধ্যমে আশু পদক্ষেপ নেওয়া হবে। (পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন, ২০১১, ইস্তাহার, ঐ, ২০১১, পৃ-১২)

কী হাল হয়েছে এই সকল প্রতিশ্রুতির আশ্বাসের?

ক্ষমতাসীন হওয়ার পর রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের প্রতি এই সরকারের প্রথম কার্যকর সিদ্ধান্ত ছিল ২০০৮ সালের ১ এপ্রিল থেকে মার্চ '০৯ পর্যন্ত বকেয়ার তৃতীয় কিস্তি একেবারে না দিয়ে ৫০% ২০১২-১৩ আর্থিক বর্ষে মঞ্জুর করা। তাও রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির চাপে। আর ঋণের বোঝা ও আর্থিক সঙ্কটের অজুহাতে মহার্ঘভাতা আগামী তিন মাস না দিতে পারার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়েছিল। ২২ নভেম্বর ২০১১ রাজ্যব্যাপী কর্মচারীদের বিশাল বিক্ষোভ ও মিছিল রাজ্য সরকারকে বাধ্য করে প্রথম মহার্ঘ ভাতার ঘোষণা করতে (৮ ডিসেম্বর '১১), তারপর রাজ্যব্যাপী বিক্ষোভ সমাবেশ (৫ জুলাই '১২)। শ্রমিক-শিক্ষক-কর্মচারীদের যৌথ কনভেনশন (৯ নভেম্বর'১২) সহ লাগাতার আন্দোলন ও চাপ সৃষ্টির ফলে ঘোষিত হয় ২য় কিস্তি মহার্ঘভাতা (২০১২) এবং ১৯ নভেম্বর বিধানসভায় জনৈক বিধায়কের লিখিত প্রশ্নের উত্তরে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের কোনো মহার্ঘ ভাতা পাওনা নেই—বলে রাজ্যের অর্থমন্ত্রীর লিখিত বিবৃতি পাঠের পরিণামে রাজ্য জুড়ে যে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে এবং আলোড়ন পড়ে যায়—তার ফলশ্রুতিতে মুখ্যমন্ত্রী ৩য় কিস্তি মহার্ঘভাতা ঘোষণা করতে বাধ্য হন। আশ্চর্যের হল তিনটি ক্ষেত্রেই স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীকেই মহার্ঘভাতা ঘোষণা করতে হয়েছে। ভুলে গেলে চলবে না পরিস্থিতির চাপে এবং রাজ্য সরকারী শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষকদের চাপেই রাজ্যের অনিচ্ছুক এবং উপেক্ষাভরা হাত থেকে মহার্ঘ ভাতার ঘোষণা এসেছে। তাই ঐক্যবদ্ধ লড়াই আর আন্দোলন ছাড়া কোনো দাবিই অর্জিত হবে না।

যে গুরুত্বপূর্ণ পাঁচ দফা দাবিকে ঘিরে সারা পশ্চিমবাংলা জুড়ে সংগ্রামের নতুন তরঙ্গ সৃষ্টি হচ্ছে তার প্রথম দাবি হল; নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সর্বজনীন গণবণ্টন ব্যবস্থা চালু করা। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও কী কেন্দ্রীয় সরকার, কী রাজ্য সরকার কেউই মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে কার্যকর এবং উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। দফায় দফায় পেট্রোল, ডিজেল, রান্নার গ্যাস, কেরোসিনের দাম বাড়ানো, রেলের পণ্যমাশুল বৃদ্ধি, অত্যাবশ্যক পণ্য আইন শিথিল, আগাম বাণিজ্যের নির্বিচার অনুমোদন, আমদানির ক্ষেত্রে পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়া, দেশের প্রয়োজন সরিয়ে রপ্তানির জন্য কৃষিজ পণ্যের উৎপাদন ইত্যাদির ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় প্রতিটি ভোগ্যপণ্যের দাম ক্রমাগত উর্ধ্বমুখী। বর্তমান রাজ্য সরকারের যিনি সর্বময় কর্ত্রী—অতীতে কোনো কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট মিটিং-এ তিনি নব্য উদারনীতির অনুসারী এই সকল ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ নথিভুক্ত করেছেন, মানুষকে নিয়ে কোনো নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলন করেছেন শোনা যায়নি। রাজ্যের ক্ষেত্রে আলুর দাম নিয়ন্ত্রণে এই সরকারের সাফল্য

কর্মসূচীর পাঁচ দফা দাবি

- **নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং সর্বজনীন গণবণ্টন ব্যবস্থা চালু করতে হবে।**
- **বকেয়া ৪২ শতাংশ মহার্ঘভাতা অবিলম্বে প্রদান করতে হবে। রাজ্য সরকার অধিগৃহীত বোর্ড-কর্পোরেশন, পঞ্চায়েত, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী সহ অন্যান্য বিধিবদ্ধ সংস্থাসমূহের আর্থিক দায়-দায়িত্ব রাজ্য সরকারকে নিতে হবে। পঞ্চম বেতন কমিশনের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অংশের (অমিতাভ চ্যাটার্জী কমিটি) কর্মচারী স্বার্থবাহী সুপারিশসমূহ অবিলম্বে কার্যকরী করতে হবে।**
- **প্রশাসনিক সন্ত্রাস ও দমন-পীড়নমূলক বদলী বন্ধ করতে হবে।**
- **প্রশাসনের সর্বস্তরে শূন্যপদগুলি পি.এস.সি.-র মাধ্যমে পূরণ এবং অনিয়মিত / চুক্তি প্রথায় নিয়োজিত কর্মচারীদের নিয়মিতকরণ সাপেক্ষে স্থায়ী কর্মচারীদের ন্যায় অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে। ওয়ার্ক-চার্জড কর্মচারীদের পূর্বের ন্যায় নিয়মিতকরণ করতে হবে। মৃত কর্মচারীদের পোষ্যের চাকরী প্রদানের পূর্ববর্তী ব্যবস্থা বহাল রাখতে হবে।**
- **অবিলম্বে ষষ্ঠ বেতন কমিশন গঠন এবং কমিশনের সুপারিশ ১ জানুয়ারি ২০১৪ থেকে চালু করতে হবে।**

এমনি যেন গত শারদ উৎসবের আগে যে আলুর দাম ছিল ৮-১০ টাকা তা এখন ২২-২৪ টাকা দরে বিকোচ্ছে। দাম নিয়ন্ত্রণের জন্য গঠিত টাস্ক ফোর্সের সদস্যরাই শোনা যাচ্ছে আলুর দাম বাড়িয়েছেন। চাল, ডাল, তেল, নুন, মশলাপাতি, কয়লা, বই, কাগজপত্র, জীবনদায়ী ঔষধ মায় হোমিওপ্যাথি ঔষধ কিছুই বাদ যায়নি। ডিম, মাংস, দুধ, দুগ্ধজাত দ্রব্যের তো তুলনা নেই। কিন্তু রা-কাড়ার জো নেই। আর এই বেসামাল মূল্যবৃদ্ধির নিয়ন্ত্রণে রাজ্যের উদ্যোগ ব্যবস্থাপনা কোথায়? আবার শুরু হয়েছে চালের দাম বাড়া। শিল্পজাত পণ্যের তো কথাই নেই। কেন্দ্র ও রাজ্যের নীতি এবং উদ্যোগগুলিই এমন যে তা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে মূল্যবৃদ্ধি মুদ্রাস্ফীতির সহায়ক ভূমিকা নিচ্ছে।

আবার এই মূল্যবৃদ্ধি প্রতিদিন বেতনের যে ক্ষয় ঘটাচ্ছে তার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ যদি আপনি মহার্ঘভাতার দাবি করেন রাজ্যের সরকারের মনোভাব এই যেন বেতন বাড়ানোর দাবি তোলা হচ্ছে। প্রতি বছর ৮-১০% হারে মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে। বেতন ভাতার মানের অবনমন ঘটেছে তবু মহার্ঘভাতা দাবি করা যাবে না। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে বারংবার চিঠি দিয়ে সাক্ষাৎ চেয়ে ব্যর্থ হতে হচ্ছে। সরকার মুখে কুলুপ এঁটেছেন। বস্তুত ১৯৬৭ ও ১৯৬৯ প্রথম যুক্তফ্রন্ট ও দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতার দাবি মেনে মহার্ঘ ভাতা বরাদ্দ করেছিল। ১৯৭০-৭৭ তা বন্ধ হয়ে যায়। পুনরায় ১৯৭৯ সালের ১ এপ্রিল থেকে চালু হয় কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা। এই সরকারের আচরণ দেখলে মনে হয় কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতার দাবি এঁরা মানতে রাজী নন। অতীতে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি, বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক শক্তি বা বামপন্থী ফ্রন্ট সরকার যখন কেন্দ্র-রাজ্যের সম্পর্কের পুনর্বিন্যাস কিংবা সংগৃহীত রাজস্বের ৫০ শতাংশ রাজ্যের হাতে দেওয়ার জন্য অর্থ কমিশন, পরিকল্পনা কমিশন সহ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বারে বারে দাবি করেছে তখন এরা কেউই সমর্থন করেনি, দাবি আদায়ে এগিয়ে আসেন নি বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিরোধিতা করেছে অথচ এখন রাজ্যের হাতে ক্ষমতা নেই এই অজুহাত খাড়া করা হচ্ছে। বর্তমানে কার্যরত চতুর্দশ ফিন্যান্স কমিশনের কাছে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের বেতন ভাতার জন্য অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দের দাবি রাজ্য সরকার করেছে এমন খবর নেই।

বর্তমানে একজন গ্রুপ-ডি কর্মচারীর এক শতাংশ মহার্ঘভাতার পরিমাণ মাসে ৬৬ টাকা (৪৯০০+ ১৭০০=৬৬০০ এর ১%)। ৪২% মহার্ঘভাতা বকেয়া থাকায় মাসে তার মাসিক ক্ষতি ২৭৭২ টাকা, বছরে তা দাঁড়ায় ৩৩২৬৪ টাকা। একজন গ্রুপ-সি কর্মচারীর এক শতাংশ মাসিক মহার্ঘভাতার পরিমাণ ৮৮ টাকা (৬২৪০ + ২৬০০ = ৮৮৪০-এর ১%)। এদের ক্ষেত্রে মাসিক বঞ্চনার পরিমাণ ৩৬৯৬ টাকা এবং তা বছরে গিয়ে দাঁড়ায় ৪৪৩৫২ টাকা। কার্যত কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা বকেয়া কিস্তিগুলি না দেওয়ার মধ্য দিয়ে রাজ্য সরকার বেতন সঙ্কোচনের নীতিই কার্যকর করছে।

রাজ্য সরকারের দেওয়া হিসাব অনুযায়ী ১ শতাংশ মহার্ঘভাতা দিতে রাজ্য সরকারের ব্যয় হয় ২৫ কোটি টাকা। ৪২ শতাংশ মহার্ঘভাতা আটকে রাখার মধ্য দিয়ে রাজ্য সরকার বছরে ১২৬০০ কোটি টাকা আত্মসাৎ করছে বলা যায়।

এর সঙ্গে ৫ম বেতন কমিশন এর দ্বিতীয় অংশ যেখানে বিভিন্ন ক্যাডারের পদোন্নতির জন্য কর্মচারী স্বার্থবাহী সুনির্দিষ্ট সুপারিশ ছিল তাও রাজ্য সরকার কার্যকর করেনি। শুধু তাই নয় কারিগরী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে যে সকল অসঙ্গতি বা বৈষম্য ছিল তা দূর করার জন্য গঠিত অমিতাভ চ্যাটার্জী কমিটির সুপারিশও (৫ম বেতন কমিশনের ৩য় অংশ) রাজ্য সরকার কার্যকর না করে ঠাণ্ডা ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছে। **(প্রতিশ্রুতি ছিল ৫ম বেতন কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করা সম্পূর্ণ হবে! পাঠক ভেবে দেখুন।)**

নতুন সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর ব্লক, মহকুমা, জেলা স্তরের কর্মচারীরা কি প্রত্যক্ষ করছেন? কি অভিজ্ঞতা গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের সঙ্গে যুক্ত কর্মচারীদের? বাড়িতে গিয়ে শাসনি, হুমকি, গালিগালাজ, মার-ধোর, জরিমানা আদায়সহ নানারকমের অত্যাচার ও নিগ্রহের সম্মুখীন হচ্ছেন বনদপ্তর, ভূমি ও ভূমিসংস্কার, স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণ দপ্তরের মহিলা কর্মচারীরা। অসম্মান ও অপমানের ভাগী হয়ে তাঁদের কাজ করতে হচ্ছে। এর সঙ্গে সংগঠন দপ্তরে হামলা, দখলদারি, লুঠপাঠ এবং বন্ধ করে দেওয়ার ঘটনা ঘটছে। অপরাধ তাঁরা রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি কিংবা তার অন্তর্ভুক্ত সমিতিগুলির সদস্য, সমর্থক বা কর্মী। শুধু জেলায় নয় কলকাতা ও শহরতলীতে এই উপদ্রব আছে। ২৩ মে '১১ মুখ্যমন্ত্রীর সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট বিবৃতি / ঘোষণাকে প্রশাসন ও এই সরকারের স্তাবকবাহিনী বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সমগ্র প্রশাসনে তৈরি করেছে নৈরাজ্য। মুখ্যমন্ত্রীকে আড়াই ডজনের মত চিঠি দিয়ে বহু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নিষ্পিত্তির অনুরোধ জানানো হয়েছে। কর্মচারী ও কাজের স্বার্থে দ্বি-পাক্ষিক আলোচনা চাওয়া হয়েছে, তা উপেক্ষিত হয়েছে, চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার পর্যন্ত করা হয়নি। সচিব, মন্ত্রীদের চিঠি দিলে কোনো উত্তর দেন না, সাক্ষাৎ করা তো দূরের কথা। কর্মচারীদের সমস্যা, অসুবিধা শোনার মতো কোনো ব্যবস্থা নেই। তার উপর আছে বদলী। এ যাবৎ প্রণীত সকল নিয়ম নীতিকে লঙ্ঘন করে শ'য়ে শ'য়ে কর্মচারীর বদলী করা হচ্ছে। হয়রানিমূলক, উদ্দেশ্য প্রণোদিত বদলী। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ কৃত্যক বিধির অভূতপূর্ব সংশোধনী ঘটানো হয়েছে। যে কোনো সার্ভিস / ক্যাডার / পোস্টের কর্মচারীকে সরকারের পছন্দের ভিত্তিতে অন্য যে কোনো দপ্তরে যে কোনো সার্ভিসে / ক্যাডারে / পোস্টে ডেপুটেশন / ডিটেলমেন্টে সার্ভিস ইউটিলাইজেশনে পাঠানো যেতে পারে। গোটা প্রশাসনকে সন্ত্রস্ত করে গণতান্ত্রিকভাবে প্রশাসন পরিচালনার এক নতুন নজির সৃষ্টি করা হচ্ছে। ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার আজ পদে পদে লাঞ্ছিত। ধর্মঘটের অধিকার আজ সরকারের নিদারুণ রক্তচক্ষুর সম্মুখীন, ধর্মঘট করলে বেতন কাটার হুমকি, চাকরিছেদের হুমকি, শাসক দলের দুষ্কৃতী বাহিনীর আক্রমণ আর একাংশ আমলাদের চোখ রাঙানি। **অথচ প্রতিশ্রুতি ছিল "শ্রমিক শ্রেণীর অর্জিত অধিকারকে রক্ষা করতে হবে।"... (ঐ পৃষ্ঠা ৭৯) আছি আমরা এক দারুণ গণতন্ত্রে!**

তিন লক্ষ শূন্যপদ পূরণ—বেকারদের চাকরির সুযোগ আর কর্মরত কর্মচারীদের বকেয়া প্রেমোশনের সুযোগসৃষ্টির প্রতিশ্রুতিগুলি আজ কোথায়? এই সরকারই প্রথমে চেষ্টা করেছিল অর্থ দপ্তরকে দিয়ে ৩০০ গ্রুপ ডি কর্মচারী নিয়োগের। ২০০৯ সালে বিজ্ঞাপন দিয়ে ২০১১ সালে ৭টি বিভাগে পিএসসি ৪০১৩ জনের একটি প্যানেল গ্রুপ ডি কর্মচারীদের জন্য তৈরি করেছিল তার অবশিষ্ট অংশ সরকার বাতিল করে নতুন করে নিয়োগ করতে গেলে স্টেট এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইব্যুনাল হস্তক্ষেপ করে। ঐ ৩০০ কর্মচারীর নিয়োগ বাতিল করে দেয়। তারপর শুরু হয় বৃদ্ধ / বৃদ্ধাদের পুনর্নিয়োগ (কনিষ্ঠতমের বয়স ৬০ বছর) আর পাইকারী হারে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ, বিভিন্ন বিচারালয়ের নির্দেশ, সরকারের বলবৎ নীতিগুলি লঙ্ঘন করে চলতে থাকে দলীয় কর্মী নিয়োগ। যাঁদের টানা দশ বছর কাজ হয়েছে বিভিন্ন স্কীমে বা সরকারী প্রকল্পে তাঁদের চাকুরীকালের নিশ্চয়তা, উপযুক্ত মজুরী, প্রান্তিক সুযোগ সুবিধা (৬০ বছর একটানা কাজ করার পর) প্রদানের যে আদেশনামা পূর্ববর্তী সরকার প্রণয়ন করেছিল তাকে খারিজ করে বর্তমান সরকার নতুন আদেশনামায় এমন একটি বিষয় যুক্ত করে (নিয়মিত / অনুমোদিত

(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে)

ইতিহাসের নতুন অধ্যায়

(পঞ্চম পৃষ্ঠার পর)

পদে নিযুক্তি ঘটেছে কিনা) যার ফলে এই নতুন আদেশনামা (৯০০৮-এফ তারিখ ১৬.১১.২০১১) তার কার্যকারিকাতা হারায়।

পি এস সি-র কাঠামোকে ক্রমাগত খর্ব করে তার হাত থেকে গ্রুপ বি, সি, বিভিন্ন সার্ভিস / ক্যাডারের নিযুক্তির সুযোগ কেড়ে নেওয়া হয়। এখন কার্যত ডব্লিউ বি সি এস ছাড়া আর কোনো নিয়মিত সার্ভিসের নিয়োগের ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। এর ফলে মেধার ভিত্তিতে স্বচ্ছতার সঙ্গে নিয়োগের জন্য পশ্চিমবাংলার যুব সম্প্রদায়ের যে সুযোগ ছিল তা চিরতরে নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে।

দশ বছরের চাকরির পর ওয়ার্ক চার্জড কর্মচারীর নিয়মিত করণের সুযোগকেও অকার্যকর করে রেখে তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে নিক্ষেপ করা হয়েছে।

পি এস সি / এস এস সি কর্তৃক নির্বাচিত (Selected) গ্রুপ সি কর্মচারীদের নিয়োগ করার জন্য নতুন বিধি প্রণয়ন করা হয়েছে। ২ বছর অস্থায়ী এবং তারপর ১ বছর আবক্ষা (probation) কালের পর একজন কর্মচারীর স্থায়ী কর্মচারী হওয়ার যে বিধি ছিল [W.B. Services (Appointment, Probation & Confirmation) rules, 1979] তাকে বাতিল করে নিযুক্ত কর্মচারীর মহার্ঘভাতা ও বাড়ী ভাড়া ভাতা কেড়ে নিয়ে তিন বছরের জন্য কর্তৃপক্ষের হুকুমের চাকরে পরিণত করা হয়েছে। তিন বছর পর পরীক্ষা দিয়ে 'বস্'কে খুশি করতে পারলে নিযুক্ত কর্মচারী absorbed হবেন। মানুষকে মধ্যযুগে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে দাসে পরিণত করা হচ্ছে।

চুক্তি প্রথায় নিযুক্ত কর্মচারীদের জন্য কোনো স্বচ্ছ নিয়োগনীতি নেই, নেই কোনো স্বচ্ছ শর্তাবলী। পরিচ্ছন্ন সম্মানজনক সুস্পষ্ট কাজের সুযোগ। তাদের কর্তৃপক্ষের 'খুশী'-র ওপর নির্ভর করবে সব সুযোগ। নিয়মিত কর্মচারীদের ন্যায় কোনো সুযোগ সুবিধা প্রণয়নের সদিচ্ছা সরকারের নেই। এক অনন্ত অন্ধকারের পথের যাত্রী যেন চুক্তিবদ্ধ কর্মচারীরা। **কিন্তু ২০০৯-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে কী ছিল প্রতিশ্রুতি? "চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগ বাতিল করতে হবে। সরকারি ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের নিরাপত্তা দিতে হবে।" (... ঐ, পৃ-২৩) কী আশ্চর্য বৈপরীত্য।**

"যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকার ৬ষ্ঠ বেতন কমিশনের সুপারিশ সরকারী কর্মচারীদের জন্য লাগু করছেন সেই হেতু রাজ্যে ৬ষ্ঠ বেতন কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করতে হবে। রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ২৭ মাসের বকেয়া বেতন বৃদ্ধির অর্থ দিতে হবে। (...ঐ ইস্তাহার, ২০০৯, পৃ-৮০)

গত ১৯ ফেব্রু '১৪ এবং ২৭ জুন ' ১৪ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছে যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকার তার কর্মচারীদের জন্য সপ্তম বেতন কমিশন গঠন করেছে এবং কর্মচারী সংগঠনগুলির প্রতিনিধিরা ০১.০১.২০১৪ থেকে (মহার্ঘভাতা ১০০ শতাংশ পূর্ণ হওয়ায়) কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করার দাবি তুলেছেন তাই পশ্চিমবাংলার কর্মচারীদের জন্য অবিলম্বে ষষ্ঠ বেতন কমিশন গঠন করা হোক এবং তার সুপারিশ ০১.০১.২০১৪ থেকে কার্যকর হোক। আশ্চর্যের হল রাজ্য সরকার বিস্ময়করভাবে এ ব্যাপারে নীরবতা পালন করে চলেছেন। যে সরকারের প্রধান প্রশাসক ৫ বছর আগে সরকারী কর্মচারীদের জন্য ষষ্ঠ বেতন কমিশন গঠনের লিখিত প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তিনি আজ কর্মচারীদের ন্যায্য দাবির ব্যাপারে বধির।

কর্মচারীরা কি মেনে নেবেন এই শ্বাসরোধকারী পরিবেশ। অধিকারহীন, বঞ্চিতের জীবন। আত্মসম্মান হারিয়ে ভয়, সন্ত্রাস আর দুষ্কৃতী বাহিনীর হাতে সঁপে দেবেন নিজেদের বর্তমান সন্তান-সন্ততিদের ভবিষ্যৎ? নাকি রুখে দাঁড়াবেন।

সভ্য মানুষের ইতিহাস হল সমস্ত বাধা-বিপত্তি, প্রতিবন্ধকতাকে ভেঙে এগিয়ে চলার ইতিহাস। প্রাকৃতিক বিপত্তি, বিপর্যয়কে যেমন মোকাবিলা করে উঠে দাঁড়িয়েছে মানুষ তেমনি মানুষের সৃষ্ট শোষণ বঞ্চনার শৃঙ্খল ছিঁড়ে বিদ্রোহ-বিপ্লবের পথে এগিয়েছে মানুষ।

যে সরকার দপ্তর স্থানান্তর, দপ্তরের সাজ-সজ্জা আড়ম্বরের জন্য গরিব পশ্চিমবঙ্গবাসীর লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করতে পারে, মেলা, উৎসব, উপঢৌকন বিতরণ করে কোটি কোটি টাকা উড়িয়ে দেয় অথচ কর্মচারীদের কিস্তির পর কিস্তি মহার্ঘভাতা বাকী রাখে, ন্যূনতম বেতন আর নতুন পেনশন আইন বাতিলের দাবিতে ধর্মঘট করলে কর্মচারীদের বেতন কেটে, চাকুরিচ্ছেদের হুমকি দেখায় তার কাছে নতি স্বীকার নয়। ২২ নভেম্বর '১১, ৫ জুলাই '১২, ৭ আগস্ট '১৩ আর ২৭ নভেম্বর '১৩-র পর ১০ সেপ্টেম্বর '১৪ উত্তাল হয়ে উঠবে কলকাতা ও উত্তর বাংলার শিলিগুড়ি শহর। হাজার হাজার কর্মচারীর দৃপ্ত পদচারণা আর উদাত্ত স্লোগান রচনা করবে ইতিহাসের আর একটি নতুন অধ্যায়। দপ্তরে দপ্তরে শুরু হয়েছে তারই প্রস্তুতি। ১০ সেপ্টেম্বর এরাজ্যের আলোর পথযাত্রী কর্মচারী সমাজের ক্ষোভের অভূতপূর্ব বিস্ফোরণের সাক্ষী থাকবে কাঞ্চনজঙ্ঘা আর শহীদ মিনার। □

ইজরায়েলী হামলা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

আন্দোলন আরও তীব্র আকার ধারণ করবে। ইজরায়েলের সঙ্গে সমস্তরকম সামরিক সম্পর্ক ছিন্ন করারও দাবি জানিয়েছে এই মিছিল।

সিআইটিইউ রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক দীপক দাশগুপ্ত বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের এই বিদেশনীতির আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। এই শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ কর্মসূচী হওয়ার কথা ছিল আমেরিকান সেন্টারের সামনে। কিন্তু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের তাবেদার রাজ্য সরকার এই কর্মসূচীর অনুমোদন দেয়নি। ছোট ছোট শিশুসহ হাজার হাজার মানুষের প্রাণ কেড়ে নিচ্ছে ইস্রায়েলী ঘাতক বাহিনী অথচ কেন্দ্র এবং রাজ্যের সরকার নিশ্চুপ। রাজ্যের শ্রমিক কর্মচারীরা এই ঘৃণ্য হত্যালীলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর। আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলন সংগ্রামের দিকে অগ্রসর হবে রাজ্যের শ্রমিক কর্মচারী সমাজ। □

সুব্রত কুমার গুহ

প্যালেস্তাইন

(তৃতীয় পৃষ্ঠার পর)

বাদ দিয়ে প্যালেস্তাইন প্রশ্ন আলোচনা করা যায় না। ভারত সরকারও ক্রমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে 'স্ট্র্যাটেজিক সম্পর্ক' গড়ে তুলে নিজের স্বাধীন অবস্থানকে দুর্বল করছে। গাজা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের অবস্থান সেই বার্তাই দিচ্ছে।

হিরোশিমা থেকে গাজা—একই ইতিহাস

হিরোশিমা দিয়ে শুরু, তবে শেষ নয়। ৬৯ বছর পেরিয়ে গেলেও সেই বেনজির মানুষের মৃত্যুমিছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও শুধুমাত্র

মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ

নিজেদের ক্ষমতা জাহির করতে জাপানের দুই শহরে আনবিক বোমা ফেলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। হিরোশিমায় ও নাগাসাকিতে। হিরোশিমায়, সঙ্গে সঙ্গেই মারা যান প্রায় ৭০,০০০ মানুষ। ক্যান্সার, তেজস্ক্রিয় বিকীরণের দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবে পরে নিহতের সংখ্যা বেড়ে হয় ২,০০,০০০। আর নাগাসাকিতে, প্রথমেই নিহতের সংখ্যা ষাট থেকে আশি হাজার।

একুশ শতকেও সেই একই আতঙ্ক। একমাস ধরে দিনরাত হামলা। আকাশে যুদ্ধ বিমান, সমুদ্রে গানবোট, জমিতে ট্যাঙ্ক। নির্বিচারে এলোপাতাড়ি বোমাবর্ষণ। হামলার লক্ষ্য গৃহস্থ বাড়ি, স্কুল-হাসপাতাল। আক্রান্তদের অধিকাংশই সাধারণ মানুষ, মহিলা ও শিশু। 'অবস্থান' বহুবার জানানো সত্ত্বেও, আক্রান্ত রাষ্ট্রসঙ্ঘের 'নিরাপদ' ত্রাণশিবির। একবার নয়। একাধিকবার। প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে বেড়েই চলেছে নিহতের সংখ্যা। যেন কেবলই সংখ্যা। নিছকই কয়েকটি সংখ্যা। স্বাভাবিকভাবেই হোয়াইট হাউস নীরব দর্শক। ইজরায়েলের এই স্পর্ধার রহস্য আসলে ওয়াশিংটনকে পাশে পাওয়া। আগ্রাসনের মধ্যেই ইজরায়েলকে নতুন করে সমরাস্ত্রও সরবরাহ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। পেন্টাগনের মুখপাত্র অ্যাডমিরাল জন কিরবির নির্বিকার বিবৃতি ঃ 'ইজরায়েলের নিরাপত্তার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এবং মার্কিন জাতীয় স্বার্থের কথা ভেবেই ইজরায়েলের প্রতি সহায়তাকে রক্ষা করা ও তাকে বাড়ানো এবং আত্মরক্ষায় সক্ষম করে তাকে শক্তিশালী করা জরুরী'। ইজরায়েলের ভিতরেই মার্কিন সমরাস্ত্রের মজুত ভাণ্ডার। যাতে জরুরী ভিত্তিতে সরবরাহ নিশ্চিত করা যায়। এই প্রথম নয়। ২০০৬, লেবাননে ৩৩ দিনের আগ্রাসনে, এই অস্ত্রের মজুত থেকেই তেল আবিবকে সমরাস্ত্র সরবরাহ করেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। শুধু গত বছরই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইজরায়েলকে বিক্রি করেছে ৩১০ কোটি ডলারের সমরাস্ত্র।

এই গ্রহের সবচেয়ে দেউলিয়া সংগঠন রাষ্ট্রসঙ্ঘ বিলকুল চুপ। রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের বাকি সদস্যরা কোথায়? কেউ বলে না 'সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র' ইজরায়েলের উপর এখনই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হোক। বন্ধ করা হোক সমরাস্ত্র কেনা। সোভিয়েত ইউনিয়ন নেই। প্যালেস্তাইনে নেই ইয়াসের আরাফতের মতো সর্বজনগ্রাহ্য এক নেতা। আরব লীগ নীরব দর্শক।

'অতল খাদের দিকে এগিয়ে চলেছি আমরা'—বলেছেন ফিদেল কাস্ত্রো। দু'বছর আগে এক নিবন্ধে ফিদেল বলেছেন, 'মানবসভ্যতার ইতিহাসে সাম্প্রতিক বিপদের মতো বিপদ কখনও মানবিকতা দেখেনি। হিরোশিমা, নাগাসাকির হাজার হাজার মানুষ জীবন দিয়ে যে পরমাণু বোমার মাসুল গুনেছিল তার থেকেও শক্তিশালী পরমাণু বোমা নিক্ষেপ করতে প্রস্তুত আজকের বোমা নির্মাতারা। অস্ত্রাগারগুলোতে মজুত রয়েছে এই মারণ সমরাস্ত্র। নিউক্লিয়ার মিসাইলের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে কুড়ি হাজারেরও বেশি। ইজরায়েলের হাতে শয়ে শয়ে পরমাণু অস্ত্র মজুত। এই জটিল পরিস্থিতিতে আমেরিকার অবস্থান এতটাই দুর্বল যে মার্কিন সহযোগী ইজরায়েল কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার আগে ন্যূনতম কথা বলার প্রয়োজনীয়তা পর্যন্ত বোধ করছে না।' ইজরায়েল বেপরোয়া। ওবামা তবু বলে চলেছেন তেল আবিবের 'আত্মরক্ষার অধিকারের' কথা। হামাসের রকেট ছোঁড়ার কথা। শুনে ফিদেল বলেছেন, 'প্যালেস্তিনীয়দের সামরিক ডকট্রিন আমি জানি না, তবে আমি জানি একটি রাইফেলও যদি থেকে থাকে, তবে তা দিয়ে যোদ্ধারা তাঁদের বাড়িগুলিকে বাঁচাতে জীবন দিতে প্রস্তুত, যা ইতিহাস দেখিয়েছে স্তালিনগ্রাদের নায়কোচিত যুদ্ধে'। আর অবরুদ্ধ গাজার আর্তস্বর বলছে ঃ 'তোমরা আমায় উৎখাত করেছ আমার ঘর, আমার জমি থেকে, তোমরা হত্যা করেছ আমার মা-বাবা, আমার ভাই-বোন, আমার শিশুদের, গুঁড়িয়ে দিয়েছ আমার অলিভ গাছ, অনাহারের মুখে ঠেলে দিয়েছ আমায়, আমার পরিবারকে, বোমা মেরেছ ত্রাণ শিবিরে পর্যন্ত। এরপরেও আমায় শুনতে হয় দোষারোপ, আমি কেন পালটা একটি রকেট ছুঁড়ি।' □

দাবি দিবসের আলোচনা সভা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

যদি আমরা ভয় কাটাতে না পারি, তাহলে পরিস্থিতির পরিবর্তন করা যাবে না। সাময়িকভাবে হয়তো

মঞ্চে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ

গণআন্দোলন কিছুটা পিছু হটেছে কিন্তু তার জন্য হতাশ হলে চলবে না। ইতিহাসের শিক্ষা হল এই পরিস্থিতির অবসান হবেই। তিনি আরও বলেন নতুন বিপদ হল কেন্দ্রে সাম্প্রদায়িক শক্তি ক্ষমতায় এসেছে। তার বিরুদ্ধেও সচেতনতা জরুরী। কারণ যাঁরা বিজেপিকে সমর্থন করেছেন, সকলে সাম্প্রদায়িকতার বিপদটা বোঝেন না। কারণ তাঁদের সেই অভিজ্ঞতা নেই। এই সমগ্র পরিস্থিতির মোকাবিলায় প্রয়োজন নির্লোভ, সাহসী ভূমিকা। সভাপতি ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্যে দিয়ে সভা শেষ হয়। আলোচনা সভা উপলক্ষে পাঁচ শতাধিক কর্মচারী উপস্থিত হয়েছিলেন। সভাকক্ষে স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় বহু কর্মচারী বাইরে দাঁড়িয়ে বক্তব্য শোনেন। □

যৌথ আন্দোলন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সাংবাদিক সম্মেলন, যৌথ কনভেনশনের মধ্য দিয়ে এর কিছুটা অগ্রগতিও ঘটেছে। কিন্তু ভবিষ্যতে সমস্ত কর্মচারীর স্বার্থেই আরও কিছুদূর একসাথে অগ্রসর হওয়া যাবে কি না, তা নির্ভর করছে পরিস্থিতির সঠিক উপলব্ধির ওপর। যে যে সংগঠনগুলি যৌথ আন্দোলনে শামিল হয়েছিল, তারা সকলেই পরিস্থিতির বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ণ করতে পারছে কিনা তার ওপর। পরিস্থিতির ভুল বা বিকৃত ব্যাখ্যা কখনও যৌথ বা একক কোনো আন্দোলনকেই সঠিক দিশা দেখাতে পারে না। রাজ্য কর্মচারীদের যৌথ আন্দোলন কিছুটা এগিয়ে আপাতত থমকে যাওয়ার কারণই হল, কোনো কোনো সংগঠন এখনও পরিস্থিতির ভ্রান্ত ব্যাখ্যার অভ্যস্ততা কাটিয়ে উঠতে পারে নি। যেমন কেউ যদি বলেন, 'যা ছিল, আছে তাই'—তাহলে কি পরিস্থিতির অপব্যাখ্যা হয় না? কেউ বলতে পারবেন বিধানসভা নির্বাচনের আগে ও পরের রাজ্য পরিস্থিতি একই আছে? না, গণমাধ্যমও চেষ্টা করে সেকথা বলতে পারছে না। যাঁরা বলছেন তাঁদের সম্পাদক নিয়ম মেনে টিফিট টাইমে দপ্তরে সভা করা সত্ত্বেও তাঁকে অন্যায়ভাবে বদলি করা হয়েছে, তাঁরা কি বলতে পারবেন বিধানসভা নির্বাচনের আগের পরিস্থিতিতে শুধু নিয়ম মেনে নয়, নিয়ম ভেঙ্গে সারাদিন মহাকরণে অবস্থান ও শ্লোগান শাউটিং করেও তাঁদের কখনও শাস্তিমূলক বদলির মুখোমুখি হতে হয়েছে কি না? পারবেন না। কারণ রাজনৈতিক পছন্দ নির্বিশেষে একথা স্বীকার করতেই হবে, তখন প্রশাসনের চরিত্র এমন ছিল না।

অথচ এই সরল সত্যটাকে স্বীকার না করে বলে দেওয়া হল, নির্বাচনের মধ্য দিয়ে নাকি শুধু সরকারী দলের রঙের পরিবর্তন হয়, আর কিছু নয়। এই বিপ্লবী অ্যাডভেনচুরিস্ট মার্কা বক্তব্য কি আদৌ বাস্তবসম্মত? এখন ধর্মঘট করলে বেতন কাটা হয়, ডাইস্-নন্ করা হয়। তখনও কি তাই হত? তখন মহার্ঘভাতা পাওয়া যেত বছরে অন্তত দু-কিস্তি। কিন্তু এখন? তখন নির্দিষ্ট সময় অন্তর বেতন কমিশনগুলি কার্যকরী হয়েছে। এখন বলা হচ্ছে কেন্দ্র টাকা না দিলে বেতন কমিশন হবে না। এমনকি যে বেতন কমিশনের (পঞ্চম) প্রথম অংশ 'লাল' সরকার কার্যকরী করেছে, তার দ্বিতীয় অংশ নিয়েও 'নীল-সাদা' সরকার কোন উচ্চবাচ্য করছে না। তাহলে লাল থেকে নীল-সাদা শুধুই রঙের পরিবর্তন? এবার রাজ্য ছেড়ে কেন্দ্রের দিকে তাকান। সেখানেওতো রঙের পরিবর্তন ঘটে গেরুয়া রঙ ক্ষমতায় এসেছে। একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের ক্ষমতায় শীর্ষে বসেছে আরএসএস-এর মতন চূড়ান্ত সাম্প্রদায়িক সংগঠন পরিচালিত একটি রাজনৈতিক দল। এও কি শুধুই রঙের পরিবর্তন? আর কিছু নয়? শিক্ষিত, সচেতন কর্মচারী সমাজের কাছে কোন কথা বলার আগে আরও একটু ভেবে বললে ভাল হয় না?

দ্বিতীয়ত, পরিস্থিতির চাপেই যার হাত ধরতে বাধ্য হচ্ছি, তাকে অপছন্দ হলেও, হাতও ধরবো আবার মুখেও আক্রমণ করবো—এই দুটো একসাথে চলে? আক্রমণটা থাক না মনে মনে। আবার যখন ভালো সময় আসবে, যখন খুশি-যা খুশি বলা যাবে, তখন নয় আবার যা বলার তা উগরে দেবেন। এখন থাক না। প্রধান বিপদের বিরুদ্ধে লড়তে লড়তে যদি পরস্পরকে গালমন্দ করার কাজটাও শুরু করেন, তাহলে প্রধান বিপদের বিরুদ্ধে লড়াইটাই দুর্বল হবে। এখন একটু সমঝে কথা বললে সংগ্রামী চরিত্র ফিকে হবে না। সংগ্রাম মানে আগুন ঝরা বক্তব্য নয়, সংগ্রাম মানে জয় ছিনিয়ে আনার সঠিক রাস্তা খোঁজা।

পরিস্থিতি ভবিষ্যতে আবার আমাদের যৌথ আন্দোলনের দিকে নিয়ে যাবেই। কিন্তু তাকে ব্যবহার করতে পারবো কিনা নির্ভর করছে আমাদের ওপর। □

সুমিত ভট্টাচার্য

ছোট সরকারের দিকে আরও এক ধাপ

মোদি সরকারের না-পসন্দ্ যোজনা কমিশন

প্রত্যেক বছর ১৫ আগস্ট, স্বাধীনতা দিবসে দিল্লীর লালকেল্লার ছাদ থেকে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন দেশের প্রধানমন্ত্রী। এটাই আমাদের দেশের সংসদীয় ব্যবস্থার রীতি। নিয়ম মেনে, এবারেও ৬৮তম স্বাধীনতা দিবসে এই দায়িত্ব পালন করেছেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদি। যদিও তিনি সদ্য নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী, তবুও স্বাধীনতা দিবসে জাতির উদ্দেশ্যে তিনি কী বলবেন, বা তাঁর সরকারের অগ্রাধিকার বা কর্ম পরিকল্পনা কী, এই নিয়ে সাধারণ মানুষ বা সংবাদ মাধ্যমের মধ্যে নতুন করে কোনো আগ্রহ তৈরি হয়নি। কারণ এই সরকারের কাজের অভিমুখ সম্পর্কে একটা ধারণা ইতিমধ্যেই তৈরি হয়ে গেছে, বিশেষ করে এই অর্থবর্ষের (২০১৪-১৫) বাজেট পেশের পর। অর্থাৎ আগের সরকারের (ইউপিএ-২) উদারীকরণ, বেসরকারীকরণ ও বিলগ্নীকরণের পথই এই সরকারেরও পথ তা স্পষ্ট হয়ে গেছে এই কয়েক মাসেই।

পি সি মহলানবীশ

এই পথেই আরও এক ধাপ এগোনোর জন্য, প্রধানমন্ত্রী যোজনা কমিশন বিলুপ্তির ঘোষণা করলেন। এর সরল অর্থই হল কেন্দ্রীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে রাষ্ট্রের ভূমিকা আরও সঙ্কুচিত হবে। বাজারকে আরও প্রসারিত হবার সুযোগ দেওয়ার জন্যই রাষ্ট্রকে আরও গুটিয়ে ফেলা। এই ঘোষণায় উল্লসিত হয়ে, কোনো কোনো মহল থেকে এমন মন্তব্যও করা হয়েছে যে, এতদিনে ভারতীয় অর্থনীতি সোভিয়েতের ভূত কাঁধ থেকে ঝেড়ে নামাল। সোভিয়েতের ভূত মানে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের পরিকল্পিত অর্থনীতির মডেলকে অনুসরণ। এটা ঠিক, রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের পর, অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার যোজনা কমিশন গঠন (১৯৫০) এবং ঐ কমিশনের নেতৃত্বে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কার্যকরী করার (১৯৫১) যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল, তার পিছনে অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছিল তৎকালীন সোভিয়েত অর্থনীতির মডেল। তবে ঐ মডেলকে সম্পূর্ণত অনুসরণ করা হয়নি, বা বলা ভালো করা সম্ভব ছিল না। কারণ ঐ মডেলকে সম্পূর্ণত অনুসরণ করতে হলে, শুরুতেই যা করতে হত তা হল, আমূল ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে সামন্ততান্ত্রিক শোষণের জোয়াল থেকে কৃষক সমাজকে (সেই সময় তাঁরা ছিলেন জনসংখ্যার আশি ভাগ) মুক্ত করা। সামন্ততন্ত্রের প্রতিনিধি কংগ্রেস সরকার স্বাভাবিকভাবেই সেই কাজ করতে চায় নি। ভূমি সংস্কার সংক্রান্ত আইন একটা প্রণয়ন করা হয়েছিল বটে, কিন্তু সেখানে এত ফাঁক রাখা হয়েছিল যে স্বনামে-বেনামে সামন্ততন্ত্র বহাল তবিয়তে টিকে গেছে।

এতদ্‌সত্ত্বেও বলা যায়, মিশ্র অর্থনীতির যে মডেল অনুসরণ করা হয়েছিল, যেখানে বেসরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি পরিকাঠামো নির্মাণ ও ভারী শিল্প গড়ে তোলার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র বিনিয়োগ করেছিল (এই দুটি ক্ষেত্রেই মুনাফা ঘরে তোলা দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া বলে বেসরকারি পুঁজি আগ্রহী হয়নি), তা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির অনুসরণেই। আর শুধু ভারতই যে একে অনুসরণ করেছিল তা নয়, বহু উন্নত দেশও তাদের বেহাল অর্থনীতিকে সামাল দেবার জন্য মিশ্র অর্থনীতির পথ গ্রহণ করেছিল। তাই তথাকথিত সোভিয়েত মডেলের ভূত যে শুধু ভারতের ঘাড়ে চেপেছিল তা নয়। পৃথিবীর বহু দেশই সোভিয়েত মডেলের কার্যকারীতাকে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল।

এই মিশ্র অর্থনীতির রূপায়ণের লক্ষ্যেই গঠিত হয়েছিল যোজনা কমিশন। যাদের কাজ ছিল সরকারী নীতি রূপায়ণে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা, অগ্রাধিকার নির্ধারণ প্রভৃতি। কৃষি, শিল্প, খনিজ সম্পদ, বিদ্যুৎ ও শক্তি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, তথ্য-প্রযুক্তি প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রের জনমুখীন ব্যবহার সংক্রান্ত পরিকল্পনা। যোজনা কমিশনের নেতৃত্বে রূপায়িত হয়েছে একের পর এক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। বর্তমানে চলছে দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। গত শতাব্দীর ষাট ও নব্বই-এর দশকে দু'বার এর ধারাবাহিকতার সাময়িক ছেদ পড়েছিল।

এই ব্যাপারে কোনো সংশয় নেই যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলি তাদের ইপ্সিত লক্ষ্য পূরণে সক্ষম হয়নি। মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলি পূরণের প্রশ্নে সোভিয়েত ইউনিয়নের ধারে-কাছেও আমরা পৌঁছতে পারি নি। কিন্তু পাশাপাশি এটাও ঠিক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির মধ্য দিয়ে বিপুল রাষ্ট্রীয় সম্পদ তৈরি হয়েছে, যা এযাবৎকাল জনজীবনে ইতিবাচক ভূমিকাই পালন করেছে। এই সম্পদকেই দেশী-বিদেশী একচেটিয়া পুঁজির হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে গত দু'দশক ধরে। যোজনা কমিশনের কাজে ফাঁক-ফোকর থাকলে তা অবশ্যই সংশোধন করা দরকার। কিন্তু তার জন্য গোটা প্রতিষ্ঠানকেই বাতিল করা সমর্থনযোগ্য নয়। আসলে আমাদের দেশের শাসক-শ্রেণি এখন মার্কিন ডায়েট-চার্ট মেনে কোনটা গিলতে হবে আর কোনটা ওগরাতে হবে ঠিক করছে। তারাই নির্দেশ দিচ্ছে — রাষ্ট্র সব জায়গা থেকে হাত গুটিয়ে নাও। সব কিছুকেই ছেড়ে দাও বাজারের চাহিদার ওপর। আর রাষ্ট্রের কোনো ভূমিকাই যদি না থাকে, তাহলে পরিকল্পনার প্রয়োজন নেই। আর পরিকল্পনার প্রয়োজন না থাকলে যোজনা কমিশনের প্রয়োজন কী? □

সুমিত ভট্টাচার্য

অর্থ দপ্তরের নোটিফিকেশন নং ৪২০১-এফ (মেড) তাং ১৩/০৮/২০১৪— চিকিৎসাজনিত খরচ অনুমোদনের আর্থিক ক্ষমতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত আদেশনামা

গত ১৩/০৮/২০১৪ তারিখে অর্থ দপ্তরের নিরীক্ষা শাখা ৪২০১-এফ (মেড) নং একটি নোটিফিকেশন জারী করে পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য প্রকল্প-২০০৮-এর ১৩(৩) নং ধারা পরিমার্জনা করে সচিবালয়, অধিকার এবং স্থানীয় অফিসগুলির চিকিৎসাজনিত খরচ অনুমোদনের আর্থিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে। নিচের তালিকার সাহায্যে তা দেখানো হল—

ডেজিগনেশন	আর্থিক অনুমোদনের বর্তমান ক্ষমতা		আর্থিক অনুমোদনের পরিমার্জিত ক্ষমতা	
	অন্তর্বিভাগ	বহির্বিভাগ	অন্তর্বিভাগ	বহির্বিভাগ
১। সচিবালয়	পূর্ণ ক্ষমতা		পূর্ণ ক্ষমতা	
(ক) দপ্তর সচিব				
(খ) বিশেষ সচিব দায়িত্বপ্রাপ্ত যুগ্ম-সচিব	৫০,০০০/-	৫,০০০/-	১ লাখ টাকা	১০,০০০/-
২। অধিকারের প্রধান	৫০,০০০/-	৫,০০০/-	১ লাখ টাকা	১০,০০০/-
৩। স্থানীয় অফিসের প্রধান	৩০,০০০/-	৩,০০০/-	৫০,০০০/-	৫,০০০/-

ভারতের আপত্তিতে ভেস্তে গেল ডব্লু টি ও'র বাণিজ্য চুক্তি

ডব্লু টি ও-র কেন্দ্রীয় কার্যালয় (জেনিভা)

ভারতের আপত্তিতে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার প্রস্তাবিত বাণিজ্য প্রোটোকল (ট্রেড ফেসিলিটেশন এগ্রিমেন্ট বা টি এফ এ) স্বাক্ষরিত হল না। জেনিভায় ডব্লু টি ও'র বৈঠকে ভারতের অবস্থান ছিল যে, সরকারী খাদ্যশস্য ভাণ্ডারের নিশ্চয়তা না পেলে বাণিজ্য প্রোটোকলে সই হবে না। কৃষিপণ্য সরকারী ভরতুকির প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত হওয়ায় এই বিষয় ভারতের পক্ষে খুবই জরুরী। বালিতে বিগত ডিসেম্বরে মন্ত্রিপর্যায়ের বৈঠকে ঠিক হয়েছিল বাণিজ্য প্রোটোকলের সঙ্গেই অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা হিসেবে খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে নিশ্চয়তা থাকবে। এ সম্পর্কে স্থায়ী সমাধানের আলোচনাও হবে। বালিতে একটি 'পিস ক্লস' যুক্ত করার কথাও হয়। কৃষিপণ্যে সহায়ক মূল্য দেওয়া এবং খাদ্য নিরাপত্তার কর্মসূচী বহাল রাখার জন্য সরকারী মজুতভাণ্ডার বহাল রাখা নিয়ে স্থায়ী সমাধানের আগে অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসাবে অস্বচ্ছ এই ধারা সামনে আসে। পরবর্তীকালে জি-২০-র বৈঠকগুলি এবং বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার আলোচনা থেকে দেখা যায়, কৃষিতে সহায়কমূল্য দেবার ব্যাপারে অন্তর্বর্তী ধারাতেও কঠোর শর্ত। ঐ ধারাতে বলা ছিল যেদিন ঐ ধারা চালু হবে সেদিন পর্যন্ত কৃষিপণ্যের দামে যে পরিমাণ সহায়তা দেওয়া হয়, তা আর কখনোই বৃদ্ধি করা যাবে না। নতুন কোনো কৃষি পণ্যক্ষেত্র সহায়কমূল্যের জন্য যুক্ত করা যাবে না। এই কারণে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সরকারী ভাণ্ডার বাড়ানোও কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়বে।

এই দ্বন্দ্ব নিষ্পত্তির জন্য ৩১ জুলাই সময়সীমা নির্ধারণ করে জেনিভায় সাধারণ পরিষদের বৈঠক বসে। বৈঠকে কার্যত উক্ত সমস্যাগুলির কোনো সমাধান না করেই বাণিজ্য সম্প্রসারণের প্রোটোকল সাক্ষরের জন্য পেশ করা হয়েছিল। ভারতীয় প্রতিনিধিরা দৃঢ়তার সাথে আপত্তি জানান। তাঁরা বলেন, বাণিজ্য সম্প্রসারণ চুক্তি নিয়ে ভারতের কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু বালির বৈঠকে খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়ে সিদ্ধান্তের কাঠামো তৈরির কথা বলা হয়েছিল। দুটি একসঙ্গে সম্পন্ন না হলে ভারত চুক্তিতে সই করবে না। ভারতের পক্ষ থেকে বিকল্প প্রস্তাব হিসাবে বলা হয়েছিল, ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে সরকারী মজুত ভাণ্ডার নিয়ে স্থায়ী সমাধান করার সময়সীমা নির্ধারিত করা হোক। অক্টোবর মাসে এর অন্তর্বর্তী পর্যালোচনা করা হোক।

৩১ জুলাই মধ্যরাত পর্যন্ত আলোচনা চললেও ভারত তার অবস্থানে অটল থাকে। শেষপর্যন্ত এফ টি এ স্বাক্ষরিত না হয়েই জেনিভার বৈঠক ভেস্তে যায়। সপ্তাহখানেক ধরে দফায় দফায় আলোচনার পরে ৩১ জুলাই রাতে ডব্লিউ টি ও'র ডিরেক্টর জেনারেল রবার্তো আজেভেদো প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করেন যে, কোনো সমাধান সূত্রে পৌঁছানো যায় নি। এই নীতি কার্যকরী হলে দেশের আভ্যন্তরীণ খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি অবহেলিত হোত শুধু তাই নয় খাদ্য নিরাপত্তা আইনেরও মৃত্যু ঘণ্টা বাজত। ফলত ডব্লিউ টি ও-তে এফ টি এ কার্যকরী করতে না দেবার ক্ষেত্রে ভারতের বিরোধিতা একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ। জেনিভা বৈঠক ভেস্তে গেলেও, এই প্রশ্নে ভারতের ওপর উন্নত দেশগুলির বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বিভিন্নভাবে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। স্বভাবতই এই চাপকে উপেক্ষা করে ভারত সরকারকে গৃহীত অবস্থান বজায় রাখতে হবে। □

মানস কুমার বড়ুয়া

অর্থ দপ্তরের আদেশনামা ৩১৬১-এফ(পি) তাং ১৭/০৬/২০১৪ এবং আদেশনামা ৩৯৬৭-এফ(পি) তাং ১/৮/২০১৪—আধা সরকারী দপ্তর গোটানো এবং সরকারী দপ্তরে নিয়োগ বন্ধের ষড়যন্ত্রমূলক প্রক্রিয়া শুরু

গত ১৭/০৬/২০১৪ তারিখে অর্থ দপ্তর ৩১৬১-এফ(পি) নামক একটি আদেশনামা বের করে যার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন কোম্পানি, কর্পোরেশন, আন্ডারটেকিং, স্ট্যাটুটারি বডি, বোর্ড সেগুলির সম্পূর্ণ বা আংশিক মালিকানা রাজ্য সরকারের হাতে রয়েছে বা যেসব লোকাল ফান্ড—যা রাজ্য সরকার দ্বারা পরিচালিত হয় বা হয় না—সেখানকার নিয়মিত কর্মচারীদের রাজ্য সরকার প্রয়োজন মনে করলে বিভিন্ন সরকারী দপ্তরে ডিটেলমেন্ট বা ডিপ্লয়মেন্ট-এর দ্বারা নিযুক্ত করতে পারবে—এই মর্মে একটি আদেশনামা বের করে। এই সমস্ত সংস্থার কর্মচারীরা সরকারী কর্মচারী হিসেবে গণ্য না। যখন এই সমস্ত কর্মচারীরা সরকারী অফিসে নিযুক্ত থাকবেন সে সময়ে তার চাকুরীর শর্তাবলী সমূহ এই সমস্ত সংস্থা দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হবে। কিন্তু তাদের মাইনে ও ভাতা, ছুটি মঞ্জুর ইত্যাদি, যে সরকারী দপ্তরে তারা নিযুক্ত হবেন সেই দপ্তর থেকেই হবে। কোনো কারণে যদি এই সংস্থাগুলি উঠে যায় তবে সরকারী দপ্তরে নিয়োজিত এইসব সংস্থার কর্মচারীদের চাকুরীর শর্তাবলী ইত্যাদি দেখভালের জন্য রাজ্য সরকার আলাদা একটি সংস্থার সৃষ্টি করবেন।

কিন্তু এই আদেশনামা দ্বারা এইসব সংস্থাগুলিতে চুক্তিতে নিযুক্ত এবং সাময়িকভাবে বা দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে নিযুক্ত কর্মীদের কম্পেনসেসনের নির্দেশ দেওয়া হয়নি। তাই গত ১/৮/২০১৪ তারিখে অর্থ দপ্তর ৩৯৬৭ নং আদেশনামা জারি করে এই জাতীয় কর্মীদের সরকারী অফিসে নিযুক্ত করার পদ্ধতি ঘোষণা করেছেন।

এই সংস্থাগুলিতে চুক্তিতে নিযুক্ত কর্মচারীদের ক্ষেত্রে পুরোনো চুক্তি বাতিল হবে এবং সরকারী অফিসে বা অন্য কোনো সংস্থায় নিযুক্ত হতে হলে আবার নতুন করে চুক্তিবদ্ধ হতে হবে। এবারে সরকারী অফিসে চুক্তিতে নিযুক্ত হবেন যে সমস্ত কর্মীরা তাদের চাকুরী কখনই নিয়মিত হবে না। পূর্বের সংস্থায় তাদের যা মাইনে ছিল চুক্তিতে সরকারী দপ্তরে নিযুক্ত হবার পরেও সেই মাইনেই থাকবে।

আবার সংস্থাগুলিতে সাময়িক / দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে নিযুক্ত কর্মচারীরা অন্য কোনো সংস্থায় বা সরকারী দপ্তরে একই বেতনে নিযুক্ত হবেন।

এই সমস্ত সংস্থাগুলি নিয়ন্ত্রণকারী দপ্তরগুলিকে এই আদেশনামা দ্বারা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে এদের অধীনস্ত সংস্থাগুলির যে সমস্ত কর্মচারীদের অন্যত্র নিয়োগ করা যাবে তাদের তালিকা তৈরি করতে এবং তারপর অন্যান্য বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে এই জাতীয় কর্মচারীদের নিযুক্ত করার ব্যাপারে আলোচনা শুরু করতে, আলোচনার পর দপ্তরগুলিকে এই জাতীয় কর্মচারীদের নিয়োগের ব্যাপারে অর্থ দপ্তরকে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পাঠাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

উপরের আদেশনামা দুটি দ্বারা আসলে যেসব লোকাল ফান্ড এবং আধা-সরকারী সংস্থা—যেগুলি আগামী দিনে গুটিয়ে দেওয়া হবে—সেখানকার নিয়মিত / অনিয়মিত কর্মচারীদের সরকারী বিভিন্ন দপ্তরে ডিটেলমেন্ট বা ডিপ্লয়মেন্টের দ্বারা নিয়োগ করা এবং তার ফলে সরকারী দপ্তরে—যেখানে লক্ষ লক্ষ পদ ফাঁকা রয়েছে সেখানে নিয়োগ না করার প্রক্রিয়া শুরু করা হল তা বলা যায়, অর্থাৎ এক ঢিলে দুটি পাখি মারার কাজে আধা সরকারী সংস্থাগুলি বন্ধ করা এবং সরকারী দপ্তরে নিয়োগ বন্ধ করা শুরু হল। □

প্রণব কর

Editor : SUMIT BHATTACHARYA
SANGRAMI HATIAR

State Co-ordination Committee
43rd Year 4th Issue, August 2014

Regd. No. : 18484/71
Price : One Rupee

এল নিনো— এক অশনি সঙ্কেত

সুতপা হাজরা

স্প্যানিশ শব্দ 'এল নিনো'-র বাংলা অর্থ ছোট্ট ছেলে। রাজ্যের ছোট্ট ছেলেদের অপ্রত্যাশিত দামাল দুষ্টমির মতো এল নিনোর দাপাদাপিতে সারা পৃথিবীতে ঘটে চলেছে খরা ও বন্যার মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়। যার নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে কৃষিকাজ, মৎস্যচাষ সহ মানুষের জীবনযাপনে।

প্রকৃতি ঃ মূলতঃ প্রশান্ত মহাসাগরের সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা দীর্ঘসময় ধরে উত্তপ্ত থাকলে তাকে এল নিনো বলে। কিন্তু এই তাপমাত্রা কেন বাড়বে বা কতক্ষণ স্থায়ী হবে তার কোনো কারণ জানা যায়নি। সাধারণত বছরের এপ্রিল মাসে পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগর উত্তপ্ত হয়। এই সময়ে তাহিতি আইসল্যান্ডে বায়ুচাপ বাড়ে ও পশ্চিমের অস্ট্রেলিয়ার ডারউইনে বায়ুচাপ কমে। বায়ুচাপের এই পার্থক্যের ফলে ট্রেড উইন্ড (Trade Wind) পূর্ব থেকে পশ্চিমে ধাবিত হয়। ফলশ্রুতিতে কিছুটা অস্ট্রেলিয়ায় ও সমগ্র এশিয়ায় বৃষ্টিপাত হয়। কিন্তু এল নিনোর বছরে ব্যহত হয় এই স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত। দ্য প্রাইমারী এজেন্সী ফর প্রিডেক্টিং অ্যান্ড মনিটারিং এল নিনোর মতে পরপর তিন মাসের সমুদ্রপৃষ্ঠের বর্তমান তাপমাত্রা ও স্বাভাবিক তাপমাত্রার পার্থক্যের গড় ৫° অতিক্রম করলেই আগামী পাঁচটি পর্যায়কে (৫x৩=১৫ মাস) এল নিনো এপিসোড বলে ঘোষণা করা যায়। এই হিসাবেরও ব্যতয় ঘটে। যেমন ২০১৩-এর ডিসেম্বরে এরা ঘোষণা করেন সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রার এই বৈষম্য মার্চ-এপ্রিল-মে-তে পৌঁছাবে ৬২°C-এ, যা প্রবল এল নিনোর সংকেত দেয়। কিন্তু এই পর্যায়ের গড় মে-তে পৌঁছায় — ০.২°C। যদি এটি —০.৫°C-এর থেকে কমে যায় তবে সেই অবস্থাকে বলা হয় লা নিনা কনডিশন। এই লা নিনা হল শীতলতর অবস্থা যখন ট্রেড উইন্ড পূর্ব থেকে পশ্চিমে বয় কিন্তু তৈরি করে স্বাভাবিকের থেকে ঠাণ্ডা জল এবং পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে অধিক বৃষ্টিপাত ঘটায়।

ইন্ডিয়ান মেটেওরোলজিক্যাল সার্ভিসের প্রাক্তন ডিরেক্টর জেনারেল গিলবার্ট ওয়াকার (১৯০৪-১৯২৪) বিশ্বকে এল নিনোর সমস্যা সম্পর্কে অবহিত করান। ভারত, চীন, দঃ আফ্রিকা, ব্রাজিল ও মিশরের খরার কারণ খুঁজতে গিয়ে ওয়াকার ও তাঁর দলের সদস্যরা পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরের ক্রান্তীয় অঞ্চলের অস্বাভাবিক উষ্ণ হয়ে ওঠার সাথে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের জলবায়ুর পরিবর্তনের একটি সম্পর্ক লক্ষ্য করেন।

এল নিনোর প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ১৮৭৭ সালে, যখন সমস্ত দক্ষিণ ভারত এবং বম্বে ডিভিশন কালান্তক খরার কবলে পড়ে এবং ৬ মিলিয়ন মানুষের মৃত্যু হয়। যদিও এজন্য ব্রিটিশ পলিসি অনেকাংশে দায়ী ছিল। এরপর ১৮৯৯ সালেও ভারত, চীন, দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রাজিল ও মিশর খরার কবলে পড়ে। ওয়াকার প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের এই অস্বাভাবিক উষ্ণায়নের নাম দেন সাউদার্ন অসিলেশন। তার কয়েক দশক পরে বিজ্ঞানীরা এল নিনোর পূর্বাভাষ দিতে সক্ষম হন।

প্রভাব ঃ বিগত দশকে দেশ একাধিক খরার সাক্ষী থেকেছে। ২০০২, ২০০৪ ও ২০০৯ তিনটি বছরই এল নিনোয় আক্রান্ত। উক্ত তিনটি বছরের মধ্যে ২০০৯-এ এই খরা সবচেয়ে খারাপ জায়গায় পৌঁছেছিল। যে কারণে দেশে খাদ্যে ব্যাপক মন্দা দেখা দিয়েছিল। বাস্তবিক ইউপিএ সরকার পতনের এটা একটা বড় কারণ। চলতি বছর ২০১৪ এল নিনো বছর বলে পূর্বাভাষ রয়েছে। আই এম ডি ইতিমধ্যেই ভারতে স্বাভাবিকের তুলনায় কম বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনার কথা জানিয়ে দিয়েছে। তাই যে দেশে ৬০ শতাংশ খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল সেখানে কম বৃষ্টিপাতের অর্থ খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন হ্রাস পাওয়া ও ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধির আশঙ্কা। পৃথিবীর প্রায় সব দেশ এল নিনোর প্রভাবে আশঙ্কিত। নেচার কম্যুনিকেশনে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ অনুযায়ী বিশ্বে উৎপাদিত খাদ্যদ্রব্যের উপর এল নিনোর প্রভাব ২২ থেকে ২৪ শতাংশ হতে পারে। সবচেয়ে আশঙ্কার কথা এই যে এল নিনো ঠিক কখন ও কতটা ক্ষতি করতে পারে তার কোনো আগাম পূর্বাভাষ বিজ্ঞানীরা দিতে পারছেন না, ফলে রাষ্ট্রগুলির পক্ষ থেকে আগাম পরিকল্পনার কাজও ব্যাহত হচ্ছে।

এল নিনোর আর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব বিশ্লেষণের জন্য বিশ্বের তাবৎ জলবায়ু গবেষণা সংস্থাগুলি স্যাটেলাইট সহ সমস্ত আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার করে এই সমস্যার গোড়ায় যাওয়ার চেষ্টা করে চলেছে। দিল্লীর এক বেসরকারী জলবায়ু পূর্বাভাষ কোম্পানী স্কাইমেটের সি ই ও-র মতে ভারতের বিগত ১৩টি খরার মধ্যে ১০টির সঙ্গে এল নিনোর সুদৃঢ় যোগাযোগ আছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর রিসার্চ অন ইন্টারন্যাশনাল ইকনমিক রিলেশন এর কর্ণধার শ্বেতা সাইনি জানান ভারতে এল নিনো আক্রান্ত সব বছরেই যেমন খরা হয়নি তেমনি এল নিনো ছাড়াও খরা হয়েছে যেমন ১৯৭৪ সালে খরার কারণ লা নিনা, কিন্তু ১৯৮০ পরবর্তী সব খরাতেই এল নিনোর প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে। তিনি আরও বলেন এল নিনো এবং ভারতীয় জলবায়ুর এক অদ্ভুত সংযোগ রয়েছে। যে বছরে সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রার বৈষম্য এপ্রিল থেকে অক্টোবরের মধ্যে ঘটে দেশ খরার কবলে পড়ে। কিন্তু এই ঘটনা বছরের অন্য মাসগুলিতে ঘটলে খরা হয় না।

মিনিস্ট্রি অফ আর্থ সায়েন্স-এর বিজ্ঞানী এম রাজীভন এর মতে ২০১৪, এল নিনো বছর হলেও তার ফলে দক্ষিণ আমেরিকায় বন্যা হলেও ভারতে তার প্রভাব পড়বে না যেভাবে ১৯৯৭-৯৮ সালে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর এল নিনোর সময় ভারত সেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। সম্প্রতি নেচার ক্লাইমেট চেঞ্জ পত্রিকায় প্রকাশিত বিশ্বের স্বনামধন্য গবেষকদের গবেষণালব্ধ তত্ত্ব জানাচ্ছে বিগত দুই দশকে এল নিনো ঘটার হার ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। এই হারে চললে ২০৯০ সালে এটি দ্বিগুন হয়ে যাবে। গবেষকদের মতে এল নিনোর এই ফ্রিকোয়েন্সি বাড়ার মূল কারণ বিশ্ব উষ্ণায়ন বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং। বোস ইন্সটিটিউটের বিজ্ঞানীদের মতে এই ঘটনা প্রশান্ত মহাসাগর ছাড়া আর কোনো সাগরে বা মহাসাগরে ঘটে না তাই এর প্রভাব এই অঞ্চলগুলিতেই বেশি।

এখন প্রশ্ন এল নিনোর প্রভাব কাটাতে ভারত কতটা প্রস্তুত। দিল্লীর আম্বেদকর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অরিন্দম ব্যানার্জীর মতে চলতি বছরে গম ও চালের মজুতের পরিমাণ ৬২.২৩ মিলিয়ন টন যা দেশের খাদ্যের লক্ষ্যমাত্রা ২৫ মিলিয়ন টনের চেয়ে বেশি। গণবণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে এই খাদ্যশস্য গরিবদের মধ্যে পৌঁছে দিলে উদ্ভূত সঙ্কট থেকে বেরোন সম্ভব। কিন্তু এ সমাধান সাময়িক। আনপ্রেডিক্টেবল এল নিনো থেকে বাঁচতে সরকারকে অবশ্যই ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে পরিকল্পনা নিতে হবে। ক্লাইমেট জাস্টিসদের মতে আমাদের সেচ ও জল সংরক্ষণের উন্নত ও বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এই সমস্যার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য। একটি প্রবাদ আছে যে, বর্ষা হল ভারতবর্ষের চিফ ফিনান্স মিনিস্টার। এখন দেখার নতুন সরকার কিভাবে এই নয়া চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করেন। □

তথ্য সূত্র —ডাউন টু আর্থ

যাত্রা শুরু করলো 'নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক'

দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর অবশেষে একটি পৃথক বহুজাতিক ব্যাঙ্ক তৈরির মাধ্যমে ব্রিকস গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলি যেমন একদিকে বিশ্বব্যাঙ্ক ও আই এম এফ-এর মাধ্যমে বিশ্ব অর্থনীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমী দুনিয়ার আধিপত্যবাদী যে ভূমিকা তাকে খর্ব করতে চাইছে, অন্য দিকে তেমনি নিজেদের গোষ্ঠীতে সদস্য সংখ্যা বাড়িয়ে বিশ্ব অর্থনৈতিক ক্ষমতার ভারসাম্য নিজেদের দিকে টানতে চাইছে। বর্তমান বিশ্বের মোট উৎপাদনের ২০ শতাংশ আসে ব্রিকস-এর পাঁচটি দেশ যথা— ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চিন ও দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে। দক্ষিণ আফ্রিকা ব্রিকস-এর সদস্য হয় ২০১০ সালে।

নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক তৈরির কারণ শুধুমাত্র সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতিকে রুখে দেওয়াই নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ক্ষমতা এবং বিশ্ব বাণিজ্যে মার্কিন ডলারের প্রতি পত্তিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আন্তর্জাতিক অর্থ ব্যবস্থায় আরও বেশি করে নিজেদের পক্ষে দর কষাকষির জায়গা তৈরি করাই এর মুখ্য উদ্দেশ্য। ২০১১ সালে ইউরো সঙ্কট সামনে আসার পর এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল, বিশ্ব বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মার্কিন ডলারের জায়গা নেওয়া ইউরোর পক্ষে বেশ কঠিন। গত বছর মার্কিন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ফেডারেল রিজার্ভ তাদের মাসিক ঋণ প্রকল্প গুটিয়ে নেওয়ার প্রস্তাবে গোটা বিশ্বে, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে, যে অর্থনৈতিক সঙ্কটের আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছিল তার পরই ব্রিকস ব্যাঙ্ক তৈরির প্রয়োজনীয়তা আরও বেশি করে অনুভূত হয়। এই কারণেই নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের অন্যতম উদ্দেশ্য, বৈদেশিক মুদ্রার বাজারে হঠাৎ কোনো অস্থিরতা তৈরি হলে উন্নয়নশীল দেশগুলি যাতে বিশেষ প্রভাবিত না হয় তার জন্য আর্থিক সাহায্য দেওয়া।

একদিকে যেমন এই নতুন ব্যাঙ্ক, আই এম এফ ও বিশ্ব ব্যাঙ্ককে কিছুটা হলেও চ্যালেঞ্জ জানানোর লক্ষ্যে গঠিত হল, তেমনই কাঠামোর দিক থেকেও গুরুতর পার্থক্য থাকছে। এই ব্যাঙ্কের পরিচালনার নীতি হবে 'এক দেশ, এক ভোট'। যে দাবি উন্নয়নশীল দেশগুলি বিশ্ব ব্যাঙ্কের কাছে বহুদিন ধরে জানিয়ে এসেছে। বিশ্ব ব্যাঙ্ক, আই.এম.এফ চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্র দেশগুলির তর্জনী হেলনে। তাদের ভেটো প্রয়োগের ক্ষমতাও রয়েছে। কিন্তু বিপরীত নীতিতে চলবে ব্রিকসের নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক। প্রত্যেক সদস্য দেশ যেমন ব্যাঙ্কে সমপরিমাণ মূলধন রাখবে, তেমন প্রয়োজনে এক দেশ অন্য দেশকে তা দিয়ে দিতেও পারবে। ব্যাঙ্কের প্রাথমিক মূলধন সমান ভাবেই ভাগ হবে। তবে শুরুতে জরুরী তহবিলে সবচেয়ে বেশি অর্থ দিচ্ছে চিন। বিশ্বের বৃহত্তম বিদেশী মুদ্রা সঞ্চয়ের মালিক চিন দেবে ৪১০০ কোটি ডলার। ভারত, ব্রাজিল, রাশিয়া দেবে ১৮০০ কোটি ডলার। দক্ষিণ আফ্রিকা দেবে ৫০০ কোটি ডলার। ব্যাঙ্কের প্রথম সভাপতি ভারত থেকে হলেও তা চলবে রোটেশনের পদ্ধতিতে। ব্যাঙ্কের সদর দপ্তর হবে চিনের সাংহাইয়ে। ব্যাঙ্কের মূলধন তহবিল হবে ১০,০০০ কোটি টাকা। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে সদস্য দেশগুলির অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিকাঠামো তৈরির প্রকল্পে দীর্ঘমেয়াদী অর্থ যোগান দিতে পারবে এবং স্বল্প মেয়াদে বিদেশী মুদ্রার সঙ্কট দেখা দিলেও সাহায্য পাওয়া যাবে। এছাড়াও ব্রিকস ব্যাঙ্ক অন্য উন্নয়নশীল দেশগুলির সামনেও এক নতুন সুযোগ উন্মোচিত করলো। বিশ্ব ব্যাঙ্ক এবং আই এম এফ-র ওপরে নির্ভরশীলতা ছেড়ে তারাও সহজতর শর্তে ঋণ নিতে পারবে এখান থেকে।

উন্নয়নশীল দেশগুলির নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন প্রশ্নে সহযোগিতা বৃদ্ধি, বাণিজ্য সম্পর্ককে আরও প্রসারিত করা এবং সর্বোপরি নতুন একটি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সূচনা পশ্চিমী উন্নত দেশগুলি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে যে যথেষ্ট চাপের মধ্যে ফেলেছে তা ইতিমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে, ইউক্রেনে মালয়েশীয় বিমান ধ্বংসের পরিপ্রেক্ষিতে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ঐ দেশগুলির একতরফা কূটনৈতিক নিষেধাজ্ঞা ঘোষণার মধ্য দিয়ে। যদিও সুখের কথা ব্রিকস ভুক্ত দেশগুলি এই প্রশ্নে রাশিয়ার পাশেই রয়েছে। □

প্রণব কুমার কর

রাজ্যে শিল্পের ছবি ফিকে হচ্ছে

লোকসভা ভোট শেষ হতেই রাজ্যের চালু কারখানাগুলিতে সাসপেনশন অব ওয়ার্ক বা বন্ধ করে দেয়ার হিড়িক পড়েছে। সংসদে পেশ করা তথ্য থেকে জানা গিয়েছে এই সময়ে গোটা দেশে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার ক্ষুদ্র শিল্প বন্ধ হয়ে গিয়েছে। শুধু পশ্চিমবঙ্গেই বন্ধ হয়েছে ৪৯ হাজার ক্ষুদ্র শিল্প। গত তিন বছরে এ রাজ্যে ৯৯টি শিল্প বন্ধ হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ২৬টি চা বাগান, ২২টি চটকল এবং ৫১টি বড় ও মাঝারি কারখানা। এই সমস্ত কারখানা বন্ধ হওয়ায় প্রত্যক্ষভাবে কর্মহীন হয়ে পড়েছেন ১ লক্ষ ৩৩ হাজার শ্রমিক কর্মচারী। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে মালিকপক্ষ নিজেদের স্বার্থসিদ্ধিতে এই সাসপেনশন অব ওয়ার্ক এর নোটিশ ঝুলিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এ ব্যাপারে নীরবতা পালন করে চলেছেন। রাজ্যের শ্রমদপ্তর এই বন্ধ কারখানাগুলি খোলার ব্যাপারে কোন সক্রিয়তা দেখাচ্ছে না। শিল্প দপ্তরও একই রকম নিরবতা পালন করে চলেছে। অথচ আমরা দেখেছি তৃণমূল নেত্রী তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থ নির্ভর ধর্মঘট ভেঙে দিতে কতটা তৎপরতার নিদর্শন রেখেছেন। মুখ্যমন্ত্রী এ রাজ্যকে যতই তার পছন্দের রঙে রাঙিয়ে তোলার চেষ্টা করুন না কেন — রাজ্যের কৃষি শিল্প, স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি ধীরে ধীরে মলিন হয়ে উঠছে।

২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূল এ রাজ্যে শিল্পায়ন এবং কর্মসংস্থানে প্রতিশ্রুতির বন্যা বইয়ে দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করেছিল। যদি হুগলী জেলার ঐতিহ্যবাহী ডানলপ কারখানার কথা দিয়ে শুরু করা যায় তবে দেখা যাবে, বাম আমলে পবন রুইয়াকে তাদের বন্ধু বানিয়ে মমতা ব্যানার্জী বাড়িতে পর্যন্ত নিয়ে যেতেন। কিন্তু সরকারে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তারই মন্ত্রীসভার শ্রমমন্ত্রী একাধিকবার বৈঠক করেও শ্রমিকের পক্ষে কোন সমাধান সূত্র বার না করে ঐতিহ্যবাহী ডানলপ কারখানাকে উঠিয়ে দেওয়ার পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে ফেলেছেন। এছাড়াও হিন্দ মোটরস, শ্রীরামপুর স্পিনিং মিল, ভদ্রেশ্বরের বেলিস ইন্ডিয়া, জেশপ, ডাকব্যাক প্রভৃতি বড় বড় কারখানা বন্ধ হয়েছে। হাওড়ার ১১৩ বছরের ঐতিহ্যবাহী রঙ কারখানা শালিমার পেন্টস্ যারা হাওড়া ব্রিজ বা যুবভারতী স্টেডিয়াম রাঙিয়ে তোলার কারিগর সেই কারখানা আজ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। হাওড়ার হনুমান জুটমিল, এনসার ইন্ডিয়া, এ্যালাম এক্সট্রুশন লিমিটেড এই সময় কালে বন্ধ হয়েছে। হলদিয়া পেট্রোকেমে উৎপাদন বন্ধ হয়েছে এবং হলদিয়া ডক থেকে এবিজি বিদায় নিয়েছে। পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনিতে সাম্প্রতিক সফরে একটি সিমেন্ট (ও. সি.এল সিমেন্ট) প্রস্তুতের কারখানার উদ্বোধন করেছেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী। জেনে রাখা প্রয়োজন ২০০৮-০৯ সালে বামফ্রন্ট এই কারখানা প্রস্তুতের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। প্রায় সমসাময়িক সময়ে ২০০৭ সালের ২রা নভেম্বর এই শালবনিতেই জিন্দল গোষ্ঠীর এশিয়ার বৃহত্তম ইস্পাত কারখানার শিলান্যাস অনুষ্ঠান সেরে ফেরার পথে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামবিলাস পাসোয়ানের ওপর মাওবাদী হামলা ঘটানো হয়েছিল।

আজ আবার জামুড়িয়ার ইন্টিগ্রেটেড স্টিল প্ল্যাট বন্ধ করে দেওয়ার কথা ভাবছে শ্যাম গ্রুপ অব ইন্ড্রাস্ট্রিজ। বাম আমলে প্রতি মুহূর্তে শিল্প প্রসারে বাধা সৃষ্টি করে আসা বিরোধী দল আজ এ রাজ্যে ক্ষমতাসীন। এই শিল্প বিরোধীতার প্রতীক হয়ে ওঠা দলটি আজ শিল্পদরদী হয়ে উঠতে চাইলেও— জমি অধিগ্রহনের প্রশ্নে এত দিন তারা মানুষকে যেভাবে ভুল বুঝিয়ে এসেছে, তাদের নিজেদের পাতা সেই ফাঁদেই বর্তমান সরকার আটকে গিয়েছে। চিটফান্ডের রমরমা ঘটিয়ে কর্মসংস্থান ও শিল্প বিপ্লব ঘটালেও তা তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছে অচিরেই। চিটফান্ডের টাকায় বহু ছোট ও মাঝারি শিল্প গড়ে উঠলেও তা উধাও হয়ে গেছে মুহূর্তেই। প্রশাসনও চেষ্টা করে চলেছে কি ভাবে সেই প্রতারক দের বাঁচানো যায়। জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত নীতিতে সরকারের অবস্থান এবং তৃণমূল নেতাদের দাদাগিরি, শিল্পপতিদের এই রাজ্যে শিল্পস্থাপনে মানসিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। শিল্পপতিরা মুখ্যমন্ত্রীর সাথে কয়েকবার শিল্প সংক্রান্ত বৈঠক করেই বুঝে নিয়েছেন এ রাজ্যে সম্মান নিয়ে শিল্পের প্রসার ঘটানো দুরূহ হবে। □

সুগত দাস

সম্পাদক ঃ সুমিত ভট্টাচার্য
সহযোগী সম্পাদক ঃ মানস কুমার বড়ুয়া
যোগাযোগ ঃ দূরভাষ-২২৬৪-৯৫৯৩, ২২৬৫-০৯২৬ ফ্যাক্স ঃ ০৩৩-২২১৭-৫৫৮৮
ওয়েবসাইট ঃ www.statecoord.org
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে অজয় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক
১০-এ শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৪, হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক
সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কোঃ অপঃ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিঃ ১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত।